সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

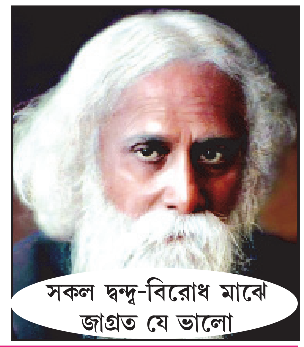

বিশেষ একাদশ-দ্বাদশ ই-সংস্করণ, এপ্রিল-মে ২০২১ ■ ৪৮তম বর্ষ

ঐতিহাসিক মে দিবস উদযাপন

বিজয় শঙ্কর সিংহ

কোভিড-১৯ সুরক্ষা বিধিকে মান্যতা দিয়েই এই বছর ১ মে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

প্রবীর মুখার্জী

কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে, সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে প্রতিপালিত হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস মে দিবস। ঐদিন বেলা ৩টেয় কর্মচারী ভবনের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য। প্রথমে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক মে দিবসের শিক্ষা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। পরবর্তীতে আজকের দিনেও শতাধিক বছর পুরোনো মে দিবসের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মে দিবস প্রতিপালনের সময়ে এ রাজ্যে বিধানসভা

আশিস ভট্টাচার্য

নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়নি (ফল প্রকাশ হয় ২ মে)। স্বভাবতই উভয় বক্তাই যে কোনো পরিস্থিতিকে মোকাবিলার করার মতো প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। □

উপস্থিত কর্মী নেতৃত্বের একাংশ

কমরেড মলয় রায়ের জীবনাবসান

চিরবিদায় নিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী তথা মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেতা কমরেড মলয় রায়। গত ২২ মে, ২০২১ সকাল ৮.৫২ মিনিটে মারণ করোনা ভাইরাস কেড়ে নিল তাঁর প্রাণ। মৃত্যুর পূর্বে কয়েকদিন কোভিড সংক্রমণ ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি লবণহ্রদের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁর দুই পুত্র, পুত্রবধু ও নাতি-নাতনিরা রয়েছেন। সহধর্মিনী প্রয়াত হয়েছেন বহু পূর্বেই।

পঞ্চাশের দশকের শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর অফিসে কাজে যোগদানের পর থেকেই তিনি রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনে যুক্ত হন। ষাটের দশকে উত্তাল গণআন্দোলনের সময় ১৯৬৭ সালে বদলী হয়ে তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে যান এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগঠন গড়ে তোলায় কাজে ব্রতী হন। জেলার সংগঠকদের সাথে নিয়ে শুধু রাজ্য কর্মচারীদেরই নয়, অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির বিকাশের ক্ষেত্রেও অগ্রনী ভূমিকা নেন এবং জেলার অন্যতম জনপ্রিয় সংগঠক হয়ে ওঠেন। ১২ই জুলাই কমিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এর ফলে রাজরোষের সম্মুখীন হ'ন। তৎকালীন কংগ্রেসের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হন। তারপর তাঁকে বদলী করে পুরুলিয়ায় পাঠানো হয়। সেই আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের কালে পুরুলিয়ায় গিয়ে সেখানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ক্রমে ক্রমে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা পরিব্যাপ্ত হতে থাকে।

কমরেড মলয় রায় ১৯৯২-১৯৯৫ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রতিপালন করেছিলেন। পরবর্তী পর্বে সর্বভারতীয় কর্মচারী আন্দোলনেও নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ছিলেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের হেড কোয়ার্টার্স সেক্রেটারি। অত্যন্ত সুবক্তা, সদাহাস্যময় কমরেড মলয় রায় কর্মচারীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আপ্ত-সহায়কের দায়িত্বও প্রতিপালন

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

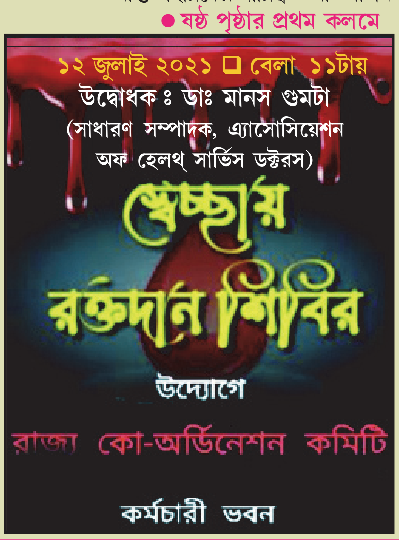

কর্মচারী বন্ধুদের কাছে আমাদের আবেদন

বিজয় শঙ্কর সিংহ
(সাধারণ সম্পাদক)

সলতে পাকানোর কাজটা শুরু হয়েছিল দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও বঙ্গ বিভাজনের ঠিক পরেই। দেশ স্বাধীন হলেও, সরকারের দমন-পীড়নের চরিত্র তখনও বিশেষ বদলায়নি। ব্রিটিশদের ফেলে যাওয়া কালা কানুনগুলোকে ফাইল থেকে বের করে চাপিয়ে দেওয়া হল কর্মচারীদের ওপর। তখন তুষের আগুনের মতো ধিক ধিক করে জ্বলছে এপার বাংলার কর্মচারীদের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা। এর সাথে এসে মিশল, ছিন্নমূল মানুষের স্রোতে ভেসে আসা ওপার বাংলার কর্মচারীদের চূড়ান্ত অনিশ্চিত জীবনের দুঃসহ বেদনা। তৈরি হল জোট বাঁধার অপরিহার্যতার জমি। প্রথমে সরকারের রক্তচক্ষু এড়িয়ে কৌশলে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ, পরবর্তীতে প্রকাশ্যে বুক চিতিয়ে অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের অঙ্গীকার। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সালে আত্মপ্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির।

শুরুতে ছিল ৯টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। কিন্তু পথ চলতে চলতে আরও অনেক সাথীরা এসে শামিল হন এই মঞ্চে। বছর বাড়তে বাড়তে আজ ৩০টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। পথ চলতে চলতে এই শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে কালক্রমে এক মহীরুহের চেহারা প্রদান করেছে। যার বিস্তার রাজ্য প্রশাসনের কেন্দ্র থেকে শুরু করে ব্লক ছাপিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত।

এই সাড়ে ছ'দশক সময়কালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেবল ভার বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়। বেড়েছে আন্দোলন-সংগ্রামের ধারও। কর্মচারী স্বার্থকে পাখির চোখ করে, চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পাহাড়সম প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে এক অক্লান্ত পরিব্রাজকের মতোই এগিয়ে চলেছে এই সংগঠন। এমনকি গত শতাব্দীর সত্তর দশকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিদারুণ হিংস্রতাও রুদ্ধ করতে পারেনি সংগঠনের গতি। ত্যাগ ও তিতিক্ষার মৃত্যুঞ্জয়ী স্মারক রচিত হয়েছে চলার পথের দু'ধারে। রাজ্যের রক্তাক্ত গণ আন্দোলনের সাথে, আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে রক্তাক্ত কর্মচারী আন্দোলন। কর্মচারী স্বার্থ হয়েছে চোখে মণি, আর চক্ষুগোলকে স্থান পেয়েছে খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ। সমগ্র চোখকে রক্ষা করতে পারলেই রক্ষা পাবে চোখের মনি। এই উপলব্ধি অভিজ্ঞতার আঁচে ঘনীভূত হতে হতে আদর্শগত দায়বদ্ধতাকে পোক্ত করেছে। মজবুত হয়েছে সংগঠন-আন্দোলন-ঐক্য। পরিশীলিত হয়েছে চেতনা।

এসেছে ১৯৭৭। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সময় পেরিয়ে আপাত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে অবগাহন। মনি-মুক্তোর মতো তুলে আনা একের পর এক অজস্র অধিকার। এযাবৎকালের শূন্য থলিতে জমা হতে থাকা বহুবিধ অর্থনৈতিক দাবি। এই সমস্ত সাফল্যের কাণ্ডারিও অপ্রতিরোধ্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কিন্তু তিন দশকের আলোকোজ্জ্বল আকাশে আবার জমেছে কালো মেঘ। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বজ্র বিদ্যুতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এযাবৎকালের পরম নিশ্চিন্তে ভোগ করা সব অধিকারগুলি। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডির্দনেশন কমিটির শরীরে বইছে অদম্য জেদের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে জুলাই-আগস্ট মাসব্যাপী সংগঠন তহবিল সংগ্রহ কর্মসূচী সফল করুন

তহবিলের হার

মোট বেতন ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ১০০ টাকা
মোট বেতন ৩০ হাজার টাকার উর্ধ্বে ২০০ টাকা
ফ্যামিলি পেনশনার্স ৫০ টাকা

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে ৪ দফা দাবিতে আগামী ১৫ জুলাই, ২০২১ রাজ্যজুড়ে টিফিন বিরতিতে "সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস"।

- □ সকলের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। কোভিড সংক্রমণ মোকাবিলায় উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- □ রাজ্য প্রশাসনে সব শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- □ কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা (১৮%) অবিলম্বে প্রদান ও নীতিহীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলীর সমস্ত আদেশনামা বাতিল করতে হবে।
- □ শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ সর্বসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষা ও বিভাজনমূলক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সম্পাদকীয়

এক শূন্য বহু শূন্যের দ্যোতক

সবেমাত্র শেষ হয়েছে সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন ও তার গণনা প্রক্রিয়া। কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত দীর্ঘতম নির্বাচনের ফলাফলও আজ সকলেরই জানা। নির্বাচনের ফলাফল মানে, রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটল কি ঘটল না। 'রাজনৈতিক ভারসাম্য' পরিবর্তনের প্রচলিত সংজ্ঞা হল শাসক ও বিরোধীদের অবস্থানের অদল বদল। সেদিক থেকে বিচার করলে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভারসাম্য স্থিতিশীলই রয়েছে, কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কারণ স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির স্থায়ী ন্যারেটিভ ছিল বামপন্থা বনাম দক্ষিণপন্থা। যখন দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় থেকেছে, তখন বামপন্থীরা বিধানসভার অভ্যন্তরে (এবং বাইরেও) বিরোধী শক্তির ভূমিকা পালন করেছে। আবার মানুষ যখন বামপন্থীদের সরকার গঠনের জন্য নির্বাচিত করেছে, তখন বিরোধী আসনে গিয়ে বসেছে দক্ষিণপন্থীরা। লক্ষণীয় হল, বাম ও দক্ষিণ উভয় বৃত্তের মধ্যেই কখনও সখনও ভাঙা-গড়া চলেছে, কিন্তু মোটের ওপর বাম-দক্ষিণ ন্যারেটিভটা অক্ষত থেকেছে।

সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনই প্রথম নির্বাচন, যার মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের সংসদীয় রাজনীতির অভিমুখের বড়সড় পরিবর্তন ঘটলো এবং এযাবৎকালের স্থায়ী ন্যারেটিভটাও আর থাকল না। কারণ বিধানসভার অভ্যন্তরে এবার থেকে আগামী পাঁচ বছর অন্তত দ্বন্দ্বটা চলবে দক্ষিণপন্থী বনাম দক্ষিণপন্থীদের। বা বলা ভালো অতি দক্ষিণপন্থী বনাম অতি অতি দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে। কারণ নির্বাচন উত্তর নবগঠিত বিধানসভায় বামপন্থীদের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকল না। বাজার চলতি মূল্যায়নের বড়ি সেবন করে গোটা বিষয়টিকে নিয়ে ভাবলে, হয়তো বা তেমন কোনো উদ্বেগের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ ঐ মূল্যায়নে নির্বাচনের ফলাফলকে শুধুমাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বা জোটের জয়-পরাজয় হিসেবেই দেখানো হয়। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কেও বাজার চলতি মূল্যায়নের মোদ্দা বিষয়টি হল, এবারে ত্রিমুখী লড়াইয়ে একটি শক্তি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছে (পরিসংখ্যানও তাই বলছে) এবং অপর দুই শক্তি তাদের নিজেদের মধ্যে শাসক ও বিরোধী অবস্থান ভাগ করে নিয়েছে। এবং অতি অবশ্যই এই সবটা ঘটেছে জনতার রায়ে। গণতন্ত্রে যা শেষ কথা।

এই মূল্যায়নে ব্যাকরণগত কোনো ত্রুটি না থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় রাজনীতির 'প্যারাডিম শিফট'টা নজর এড়িয়ে যায়। হয়তো বা ইচ্ছাকৃতভাবেই একে আড়াল করা হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন একথা বলা হচ্ছে? সে প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই দু-একটি কথা বলা দরকার। কিন্তু তার আগে এই 'প্যারাডিম শিফট'-এর তাৎপর্যটা বুঝতে হবে। আলোচনার সুবিধার্থে এবং নির্দিষ্টভাবে ফলাফলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আমরা প্রসঙ্গটিকে বিধানসভা প্রাঙ্গনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। আলাদা করে একথা বলার কারণ হল, বিধানসভায় শূন্য হলেও, নিশ্চিতভাবেই বামপন্থার চরিত্র অনুযায়ী রাস্তায় তাঁরা শূন্য হবেন না। যার প্রমাণ ইতোমধ্যেই রেড ভলান্টিয়ার্সদের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বিধানসভায় বামপন্থীদের শূন্য হওয়ার বিষয়টি রাজ্যবাসীর জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির নিরিখে আলোচনায় আনা প্রয়োজন।

বিধানসভা অর্থাৎ আইনসভা, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়নের কাজটা করা হয়। এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শাসকদলের যেমন ভূমিকা থাকে, তেমনই ভূমিকা থাকে বিরোধী দলেরও। শাসকদল প্রস্তাবিত খসড়া আইন সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা, বিকল্প প্রস্তাব, এমনকি বিরোধীদের সুপারিশ বা প্রস্তাবকে বিবেচনা করার জন্য বিধায়কদের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের কমিটিও গঠন করা হয়। এক কথায় বলা যায়, সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসকদলের পাশাপাশি বিরোধী দলেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

এই প্রেক্ষিতে আমরা রাজ্যে নবগঠিত বিধানসভার আগামী পাঁচ বছরের সম্ভাব্য গতিমুখ বিবেচনা করতে পারি।

আলোচনায় নিশ্চিতভাবেই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে রাজ্য সরকারের আর্থিক নীতির প্রসঙ্গটি। কারণ রাজ্যবাসীর রুটি-রুজির প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে আর্থিক নীতির সঙ্গেই। এই আলোচনার 'প্রিল্যুড' বা ভূমিকায় যা বলা দরকার, তা হলো গোটা দেশের অর্থনীতিটাই বিগত তিন দশক ধরে পরিচালিত হচ্ছে নয়া উদারবাদী পথে। যে উদারবাদী অর্থনীতির একটি সুনির্দিষ্ট দর্শন রয়েছে। এই দর্শনকে গত তিন দশক ধরে শুধু অনুসরণই করা হচ্ছে না, ২০১৪ পরবর্তী সময়ে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হচ্ছে। এই উদারবাদী অর্থনীতির চাকা গড়াতে শুরু করার পরবর্তী সময়ের সাধারণ অভিজ্ঞতা হলো, বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ছাড়া আর সমস্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের দলগুলিই এই উদারবাদী অর্থনীতির সমর্থক। অর্থনীতির এই মডেল জনজীবনে যে বহুমাত্রিক তীব্র সঙ্কট তৈরি করছে, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে অবামপন্থী দলগুলি যে কোনো কথা বলেনি তা নয়, কিন্তু তারা যে প্রতিবাদ করেছে, তা মূলত ফলের বিরুদ্ধে। উদারবাদের দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করা বা বিকল্প পথের কথা তারা বলেনি। যেটা করেছে শুধুমাত্র বামপন্থী দলগুলি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অভ্যন্তরে গত দশ বছরে একটি দক্ষিণপন্থী দল ক্ষমতাসীন থাকলেও, বিরোধী বেঞ্চে বামপন্থীদের অবস্থান থাকার ফলে নয়া উদারবাদী মডেলের বিকল্পের কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। বিকল্প মানে এমন নীতিগুচ্ছ যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহায়ক, যা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস করতে পারে, যা মূল্যবৃদ্ধি রোধে সক্ষম, যা কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দামের সহায়ক, যা বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার কথা বলে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, একথা বামপন্থীরা যদি বলেও থাকে, আদৌ সরকার পক্ষ মেনেছে কি? এর উত্তরে একথা বলা যায়, সরকার পক্ষ সংখ্যার জোরে বিরোধী বেঞ্চের কথা না শুনলেও, সাধারণ মানুষের স্বার্থবাহী এই বিকল্প প্রস্তাবগুলি অন্তত সংসদীয় রাজনীতির চর্চার মধ্যে থেকেছে।

সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে আইনসভা গঠিত হল, তাতে বিকল্পের কথা বলার কেউ তো রইলই না, বরং শাসকদল ও বর্তমান বিরোধী দলের নয়া উদারবাদী অর্থনীতির কর্পোরেটমুখী দর্শন সম্পর্কে কোনো দ্বন্দ্ব না থাকার ফলে, আইনসভার অভ্যন্তরে বিকল্পের কথা আগামী পাঁচ বছর অনুচ্চারিত থাকবে। এমনকি জনপরিসরে এগুলি নিয়ে বামপন্থীরা সংগ্রাম-আন্দোলন-চর্চা- আলোচনা চালালেও বিধানসভার অভ্যন্তরে তার কোনো প্রতিফলন ঘটবে না। ফলস্বরূপ এ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের বা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সম্ভাবনাও হবে **'শূন্য'**।

বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি ভিন্ন, এক আপৎকালীন পরিস্থিতি। তার বাইরে সাধারণ পরিস্থিতিতেও সমাজের বিভিন্ন দুর্বল অংশের মানুষের (ধর্মীয় পরিচিতির বাইরে) জন্য সরকারী সহায়তা প্রকল্প বা ভাতার বিরোধী বামপন্থীরা নয়। কেরালায় বামপন্থী ফ্রন্টের সরকারও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রকল্প চালু রেখেছে। নতুন নতুন প্রকল্পও গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু পার্থক্যটা হলো নয়া উদারবাদের সমর্থক দক্ষিণপন্থী দলগুলি এগুলিকে 'সেফটি' ভাল্‌ভ হিসেবে ব্যবহার করে, এই ব্যবস্থার তীব্র শোষণমূলক চরিত্রকে আড়াল করার জন্য এবং মানুষের ধূমায়িত ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য। আর বামপন্থীরা বহুবিধ প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে বিকল্প কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি, ট্রানশিসনল পর্বে সাধারণ মানুষকে কিছুটা 'রিলিফ' দেওয়ার জন্য সরকারী প্রকল্পগুলিকে ব্যবহার করে। এই যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এর সাথে অধিকারের প্রশ্নটিও জড়িত। কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান নাগরিকদের অধিকার। প্রাক্-উদারবাদ জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রীয় মডেল সর্বস্তরের নাগরিকদের ঐ অধিকারগুলি সম্পূর্ণত পূরণ না করলেও, এগুলি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেত। এই বিষয়ে রাষ্ট্র তার দায়বদ্ধতা প্রকাশ্যে অন্তত অস্বীকার করতে পারতো না। রাষ্ট্রের এই স্বীকৃতি নাগরিক সমাজের অভ্যন্তরে এক অধিকারবোধের জন্ম দিত। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হল, এই অধিকারবোধসম্পন্ন নাগরিক। যা পূর্বতন রাজতন্ত্র বা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ছিল না। ঐ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে জনগণ ছিলেন অধিকারবোধহীন এবং রাজানুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল 'প্রজা'।

নাগরিক ও প্রজার এই পার্থক্যটাকে কিন্তু অনেকটাই ঘুচিয়ে দিয়েছে নয়া উদারবাদ। এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের পরিসরটা ক্রমান্বয়ে দখল করে বেসরকারী উদ্যোগ, যার চালিকাশক্তি হল বাজার। এই বাজারে থরে থরে সাজানো পণ্য ও পরিষেবার ক্রয়মূল্য 'নাগরিক অধিকার' নয়। এগুলির ক্রয়মূল্য 'আর্থিক সক্ষমতা'। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি পরিচালিত হয় জীববিজ্ঞানে 'সারভাইভাল অফ কি ফিটেস্ট'-এর ডারউইনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী। রাষ্ট্র এখানে সংখ্যালঘু সবল বনাম সংখ্যাগুরু দুর্বলের অসম প্রতিযোগিতার নীরব দর্শক। শুধুমাত্র যখন দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্বল অংশের বাজারে টিকে থাকার মতো শক্তিটুকুও নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, তখনই রাষ্ট্রকে প্রজাবৎসল মুখোশ পরিয়ে পাঠানো হয় রিক্ত-নিঃস্ব জনগণের 'দুয়ারে'। হরেকরকম যৎসামান্য 'ভাতা'-র ঝুলি নিয়ে। ওয়েলফেয়ার স্টেটের অধিকারবোধ নয়া উদারবাদের মেশিনে ধৌত হয়ে প্রজন্মান্তরে পরিণত হয় সরকারী সহায়তা নির্ভরতায়। আইনসভায় বামপন্থীরা থাকলে সরকারী সহায়তাই শেষ কথা নয়, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের অধিকারের প্রসঙ্গটি—এই কথাগুলি অন্তত বিধিসম্মত সতর্কীকরণের মতো বারবার বলতই তারা। সরকারের কতটা টনক নড়ত তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রীয় নীতি-বিতর্কের পরিসরে প্রসঙ্গটি জিইয়ে অন্তত থাকত। বামপন্থীরা **শূন্য** হওয়ায় সে সম্ভাবনা **'শূন্য'** হয়ে গেল।

এই আলোচনার সূত্রেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক দাবি দাওয়া, বিশেষত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার বিষয়টির ওপর সার্চ লাইট ফেলে দেখা যেতে পারে। যা ছিল একসময় স্বীকৃত অধিকার, গত দশ বছরে তা ক্রমান্বয়ে দয়ার দানে পরিণত হল। এই সময়কালে একমাত্র বামপন্থীরা বিধানসভার অভ্যন্তরে কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হয়েছিল। এবার সে সম্ভাবনাও শূন্য হয়ে গেল কিন্তু!

সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের ফল, স্বাধীনতার পর প্রথম পশ্চিমবাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িক রাজীনতি প্রতিষ্ঠা দিল। এতদিন পর্যন্ত রাজনীতির প্রাঙ্গনকে ঘিরে থাকা ধর্মনিরপেক্ষতার পাঁচিলের গায়ে কোথাও কোথাও ফাটল ধরিয়ে আগাছার মতো গজিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও, এবারেই প্রথম এই পাঁচিলের একটা বড় অংশ ভেঙে ফেলে, রাজনীতির প্রাঙ্গনের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটিয়েছে। কেউ কেউ এটুকু ভেবে স্বস্তি পেতে পারেন যে, আগামী পাঁচ বছর 'লাভ জিহাদ'-এর মতো কোনো আইন সরকারী সিলমোহর পাবে না। কিন্তু একথা কি জোর দিয়ে বলা যাবে যে, গ্রাম-শহরের আনাচে-কানাচে লাভ-জিহাদের পক্ষে সোচ্চারে অথবা গোপনে প্রচার চলবে না বা বিধানসভার ভেতরেও এই নিয়ে দাবি উঠবে না?

বামপন্থীদের কড়া সমালোচকরাও একটা কথা স্বীকার করেন। তা হলো, সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি বামপন্থীদের দায়বদ্ধতায় কোনো খাদ নেই। বিপরীতে দক্ষিণপন্থী দলগুলি অনেক সময় ক্ষুদ্র স্বার্থে দোদুল্যমান বা আপসকামী হয়ে পড়ে। আমাদের রাজ্যেই বর্তমান শাসকদল এমন দৌদুল্যমানতার বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আইনসভার অভ্যন্তরে নীতি প্রণয়নের প্রশ্নে এই দোদুল্যমানতা কোনোরকম ছাপ ফেলতে না পারে, তার জন্য সদা সতর্ক প্রহরীর ভূমিকায় থাকে বামপন্থীরা। বামপন্থীরা শূন্য হওয়া মানে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত পাহারাদার **'শূন্য'** হল এবারের বিধানসভা।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় বামপন্থা বনাম দক্ষিণ পন্থার ন্যারেটিভ এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি মানুষের চেতনাকে শানিত করত। বেশ কয়েক বছর ধরেই এই সংস্কৃতিকে কলুষিত করার পরিকল্পিত উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। যা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল এবারের প্রাক্ নির্বাচনী প্রচারে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। একের বৃদ্ধি অপরটির বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অছিলায় এই অপসংস্কৃতির ভালোরকম চাষ হয়েছে। সাফল্যের ঝুলিও কম-বেশি ভরেছে দু-পক্ষেরই। এক্ষেত্রে এটি ছিল উইন-উইন রণকৌশল। স্বভাবতই যে সেচের জলে বাইরে ফসল মন্দ হল না, খাল কেটে সেই জলকে এবার বিধানসভার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা হবে। প্রাক্ নির্বাচনী প্রচারে বামপন্থীরা নিজস্ব সুস্থ রাজনৈতিক ভাষ্যের বাঁধ দিয়ে, ঐ অপ-সংস্কৃতির ভরা কোটালকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছিল। পারেনি, কিন্তু চেষ্টাটা ছিল। বাইরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গানের মিনিয়েচার এবার দেখা যাবে বিধানসভার অভ্যন্তরে। কিন্তু সেখানে বামপন্থীরা শূন্য। তাই ঠেকানোর চেষ্টাটুকুও হবে **'শূন্য'**।

অর্থাৎ আইন প্রণয়নের ল্যাবরেটরিতে বামপন্থীদের অনুপস্থিতির তাৎপর্য বহুমাত্রিক। এক্ষেত্রে নিউম্যারিকাল শূন্য, অর্থনীতি-সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও বিকল্পের শূন্যতার দ্যোতক। যা রাষ্ট্রীয় নীতি ও নাগরিক চেতনার আন্তঃসম্পর্কে টিকাবিহীন ভাইরাসের মতোই ক্ষতিকারক। □

৯ জুন, ২০২১

শোক সংবাদ

আর সি জগ্গা

চলে গেলেন আর সি জগ্গা, নীরবে। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে। হরিয়ানার সর্ব কর্মচারী সংঘ (নিয়মিত / অনিয়মিত সমস্ত ধরনের কর্মচারীদের সংগঠন) এর অবিসংবাদী নেতা। প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। প্রায় দু'দশক সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে কর্মচারীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার, ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮ বার কারাবরণ করেছেন। সাধারণ সম্পাদক আর সি জগ্গার নেতৃত্বে সর্ব কর্মচারী সংঘ ২০০০ সালের ১২ ডিসেম্বর বিদ্যুৎ, পরিবহনসহ সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে বিশাল মানববন্ধনের কর্মসূচী নেন। এই কর্মসূচী ছিল ১০ জানুয়ারি, ২০০১ পরবর্তী সর্বভারতীয় ধর্মঘটের প্রস্তুতি। সারা হরিয়ানায় সাড়া পড়ে যায়। ক্ষিপ্ত বিদ্বিষ্ট হরিয়ানা সরকার আর. সি. জগ্গাকে ১৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করে। যা নজিরবিহীন। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন এর প্রতিবাদে দেশজুড়ে কর্মসূচী নেয়। মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করে প্রতিবাদ পাঠায়। পরে ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তন হলে এই জরিমানা মকুব হয়। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সম্মেলনে তিনি সংগঠনের সম্পাদক / সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন এবং দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে তিনি উত্তর বিজলী বিতরণ নিগমের এ্যাকাউন্টস অফিসার হিসেবে অবসর নেন। হরিয়ানার কর্মচারী আন্দোলনকে রাজ্যের অন্যতম গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে পরিণত করা এবং সর্বভারতীয় আন্দোলন এর গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান আর আপসহীন নেতা হিসেবে তাঁর উজ্জ্বল কর্মচারীদরদী ব্যক্তিত্ব কর্মচারী সমাজের কাছে বহুকাল সমাদৃত হবে। তাঁর অম্লান স্মৃতির উদ্দেশ্যে আনত শ্রদ্ধা জানাই। □

প্রবীর সরকার

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রবীর সরকার গত ২ জুন, ২০২১ সকালে নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

কমরেড প্রবীর সরকার তাঁর চাকুরি জীবনে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীদের সংগঠিত করার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐ বিভাগের কর্মচারী হিসেবে কর্ম জীবনের শুরু থেকেই তিনি রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। ক্রমে কর্মী থেকে ঐ সংগঠনের নেতৃত্বে উন্নীত হন এবং সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। ঐ একই সময়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবেও রাজ্য কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সাথে যুক্ত হন, এবং রাজ্যব্যাপী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত হন। পরবর্তী পর্বে ঐ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। এই সময় তিনি পুনরায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। কমরেড প্রবীর সরকার একাধারে ছিলেন সুবক্তা, সুলেখক ও প্রাবন্ধিক।

কমরেড প্রবীর সরকারের জীবনাবসানে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক। তিনি তাঁর শোকবার্তায় কমরেড সরকারের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। সমাজ মাধ্যমে কমরেডের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই কর্মচারী আন্দোলনের বহু প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃত্ব প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। □

এগিয়ে নিয়ে চলুন ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’কে

উৎসর্গ মিত্র

বাংলায় ‘ইয়াস’ যেদিন আছড়ে পড়লো, সেদিনই দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়ায় দুটো ক্লিপিং ভাইরাল হয়ে গেছে। ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে সক্রিয় এমন কোনো মানুষেরই বোধহয় দেখতে বাকি ছিল না ক্লিপ দুটো। দুটোই দুই নামী টিভি চ্যানেলের সংবাদ প্রতিবেদনের দুটি অংশ। একটিতে দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন নারী সাঁতার কাটতে কাটতে বলছেন বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারে তাঁদের সঙ্কল্পের কথা, বলছিলেন জীবন বাজি রেখে তাঁরা চলেছেন এমন মানুষের সন্ধানে। মানব হিতে এমন নিবেদিত প্রাণ দুটি মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিক দারুণ উত্তেজিত, আবেগে গলা বুজে আসছে তাঁর। দ্বিতীয় ক্লিপটিতে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে আছেন, পাশে দুটি মানুষ। সাংবাদিকের কাঁধের ওপর একটা ব্যাগ উঠে পড়েছে, মানুষ দুটির হাতে দুটি প্রমাণ সাইজের কাতলা মাছ। সাংবাদিক বলছিলেন কিরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা পড়েছেন, পাশের মানুষ দুটিকে দেখিয়ে তিনি বলছিলেন পুকুর ভেসে যাওয়ার ফলে কিভাবে মাছ চাষের ক্ষতি হয়েছে, মাছ কিভাবে সব ভেসে গিয়েছে সেই কথা। ইনি আরও উত্তেজিত—গলা দিয়ে আওয়াজ প্রায় বেরুচ্ছেই না উত্তেজনার ঠ্যালায়। দুটো ক্লিপিং-ই সাঙ্ঘাতিক রোমহর্ষক।

চমকটা ছিল ক্লিপিং-এর শেষ দিকে। প্রথম ক্লিপিং-এ দেখা যাচ্ছে যেখানে মানুষ দুটো সাঁতার কাটছে, সেখানে আসলে হাঁটু জল—যারা এতক্ষণ সাঁতার কাটছিল, তারা এবার দিব্যি উঠে চলে গেল! সন্দেহ নেই ক্যামেরাম্যানের অসাবধানতায় এই অংশটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আজকের সংবাদ মাধ্যমের নগ্ন রূপকে এক ঝটকায় মানুষের সামনে তুলে ধরেছিল। এই সম্পর্কে অন্য এক প্রথিতযশা সংবাদ মাধ্যমের ততোধিক প্রথিতযশা উপস্থাপিকাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি খুব উদাস মুখে উত্তর দেন যে, তাঁদের মাধ্যমে এমন কোনো ‘ধোঁকা’র দেখা মেলে না। মজা হচ্ছে, সাংবাদিকের কাঁধে ব্যাগ বসা যে দ্বিতীয় ক্লিপিংটার কথা একটু আগে বলা হলো, সেটা এই প্রথিতযশা সংবাদ মাধ্যমেরই। এর রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়লো দিনের শেষে অন্য এক ক্লিপিং-এ, যেখানে দেখা যাচ্ছে সাংবাদিক প্রবর বুক জলে দাঁড়িয়ে রীতিমতো নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর কাঁধে ব্যাগটাকে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে আর পাশে ডেকে এনে দাঁড় করাচ্ছেন মাছ হাতে নিরীহ দুই লোককে। অর্থাৎ দিনের শেষে প্রমাণ হলো যারা নিজেদের সারা দিন ধরে সাধু বলে এসেছে, তারাও আসলে ভণ্ডই!

প্রশ্ন হচ্ছে, ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’এর পাতায় ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’ সম্পর্কেই বলতে গিয়ে এসব ঘটনার অবতারণার কারণ কী? অবতারণা করা হলো এটা দেখাতে যে আজকাল সংবাদ মাধ্যমের শক্তির কথা প্রমাণ করতে সদাই ব্যস্ত যাঁরা, তাঁরা আসলে নিজেদেরই অজান্তে এক নিদারুণ ভণ্ডামীর শিকার। সংবাদ মাধ্যমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়া ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে যদি লড়তেই হয়, তাহলে ‘যে কোনোভাবেই হোক’, সে মাধ্যমকে বশে আনার চেষ্টা করে নয়, লড়তে হবে তাদের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিয়ে। সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কে মানুষের মনে সার্বিক অবিশ্বাস গড়ে দিতে হবে। এ কাজ করতে গেলে দরকার সার্বিকভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া, মনের মধ্যে জেদ তৈরি করা আর হাতের কাছে তথ্য ভাণ্ডার সদা মজুত রাখা। সংগঠনের পত্রিকাকে (যা এক অর্থে সংগঠনের ‘সংবাদপত্র’ও বটে) যদি ‘সফল’ হতে হয়, তাহলে তাকে এই কাজগুলোই সফলভাবে করতে হবে—পাঠককে সার্বিকভাবে ওয়াকিবহাল করতে হবে, তাদের মধ্যে জেদ তৈরি করতে হবে, লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য ভাণ্ডার তাদের সরবরাহ করতে হবে।

রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির (তখন তার নাম ছিল ‘রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি’) মুখপত্র ‘ইসক্রা’-র গঠনপর্বের উষা লগ্নে লেনিন একবার বলেছিলেন, “পত্রিকা শুধুমাত্র যৌথ প্রচারক বা যৌথ আন্দোলনকারীর ভূমিকাই নেয় না, সে এক যৌথ সংগঠকও বটে। সংগঠন যদি হয় এক নির্মীয়মান ভবন, তাহলে পত্রিকা হলো তার উপরিকাঠামো, যার শক্তির ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে কতজন মানুষ থাকতে পারবে। এর শক্তির ওপর নির্ভর করে একজন বিল্ডার (পড়ুন একজন সংগঠক) ঠিক করেন সে বাড়ির চেহারা কেমন হবে, তাকে কী নকশা দেওয়া যাবে”। অর্থাৎ, দুর্বল পত্রিকা সম্পন্ন কোনও সংগঠন কখনও শক্তিশালী হতে পারে না। পত্রিকা যদি তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে না পারে, তাহলে সংগঠন ভুল পথে যেতে বাধ্য, তার সৈনিকরা দুর্বল হতে বাধ্য—দুঃসময়ে সে সংগঠন ভেঙে পড়তে সময় নেয় না।

আজ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যে মহীরুহে পরিণত হয়েছে, বারে বারে আঘাত প্রাপ্ত হয়েও সে যে বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি, তার মূলেও আছে ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’-এর ভূমিকা। দুর্দিনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে চরম প্রয়োজনের সময়ে তাঁদের এবং সংগঠনের অপরাপর সদস্যদের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যুগিয়ে সঞ্জীবিত করে রেখেছিল এই ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’ই। প্রশাসনের চরম নিপীড়নের সময়ে সে-ই বারে বারে হয়ে উঠেছে হাজারো কর্মচারীর নির্বাক মুখের বাঙ্ময় প্রতিনিধি, তাদের মত প্রকাশের নির্ভীক মাধ্যম। সংগঠন চাঙ্গা হয়ে উঠতে বেশি সময় নেয়নি।

বর্তমানে কি কোনো সংবাদপত্রে বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে জনগণের মতামতের প্রতিফলন থাকে? বর্তমানে কোনও ‘প্রভাবশালী’ পত্রিকা কি বৈজ্ঞানিক ভাবে সঠিক ও প্রগতিশীল কোনো নতুন মত তৈরি করে? একুশ শতকের শুরুর দিকে দৈনিক সংবাদপত্রগুলির মালিকানা কি জনগণের হাতে আছে? এর সবগুলোরই উত্তর হলো—‘না’! পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের সংবাদপত্র এখন সে দেশের কর্পোরেট পুঁজির হাতে। দেশের প্রায় প্রতিটা প্রচার মাধ্যম তথা পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভি, ইন্টারনেট এখন পুঁজিপতিদের দখলে। ফলে এসব প্রচার মাধ্যমে জনগণের প্রগতির কোনো কথা থাকে না। মানুষ এখন টিভির চোখে দেখে, খবরের কাগজের পাতা গিলে খায়, রেডিও শুনে ঘুমায়, টিভির শব্দে জেগে ওঠে আর যেহেতু তারা এটা করে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন, সেহেতু তাদের এই ‘অভ্যাস’-এর সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিরা যে কোনোরকম নিয়ম-নীতিকেই বিসর্জন দিয়ে ইচ্ছে মতো অহরহ খবর ‘বানায়’ নিজের স্বার্থের সাথে খাপ খাইয়ে প্রচারের উদ্দেশ্যে। বাছবিচারহীন ভাবে চলতে থাকে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে সমস্ত খবর

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার সাথে সাথে তামিলনাড়ু, আসাম ও পুদুচেরিতেও বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই নির্বাচন পর্বে মোটের ওপর জোর ধাক্কা খেল আর এস এস-এর মদতপুষ্ট কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি। তামিলনাড়ুতে ডি এম কে জোটের কাছে অনেক ব্যবধানে পরাস্ত হলো এ ডি এম কে-বিজেপি জোট। এবারের নির্বাচন পর্বে বিজেপির একমাত্র সান্ত্বনা আসাম। সেখানে তারা সরকার ধরে রাখতে পারলো। কেন্দ্রশাসিত এলাকা পুদুচেরিতে এন আর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে নামমাত্র ব্যবধানে জয়ী হলো বিজেপি, যদিও অধিকাংশ আসনেই এন আর কংগ্রেস জয়ী হয়েছে।

এবারের নির্বাচন পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিভিন্ন রাজ্যে প্রচারের কাজে চষে বেড়িয়েছিলেন। সব রাজ্যেই তারা ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের ধুয়ো তুলেছিলেন। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব পাঁচ রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে সমানে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি করার চেষ্টা চালিয়েছে ও বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে। এসব সত্ত্বেও মানুষের সমর্থন পেতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া ছাড়া আর কোনো মুনাফাই তাদের হয়নি। পাঁচটি রাজ্যের মোট বিধানসভা আসনের মাত্র ২০ শতাংশ তারা পেয়েছে। একদা মোদী ম্যাজিক বলে যা শোনা যেত এবার তার ছিটেফোঁটাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তামিলনাড়ুতে ডি এম কে নেতৃত্বাধীন জোট তাৎপর্যপূর্ণ জয় পেয়েছে। ওই রাজ্যে দশ বছর পর সরকার গড়তে চলেছে ডি এম কে-র নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ জোট। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ডি এম কে নেতা এম কে স্ট্যালিন। রাজ্যের ২৩৪টি আসনের মধ্যে ডি এম কে জোট ১৫৯টি আসন পেয়েছে। অন্যদিকে এ ডি এম কে-র নেতৃত্বাধীন বিদায়ী শাসক জোট এন ডি এ-র ঝুলিতে গিয়েছে মাত্র ৭৫টি আসন। ডি এম কে জোটের মধ্যে কংগ্রেস ও বামপন্থীরাও আছে। সি পি আই (এম) ২টি আসনে ও সি পি আই ২টি আসনে জয়ী হয়েছে। এ ডি এম কে-র শরিক বিজেপি ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৪টি আসনে জিততে পেরেছে। তামিলনাড়ুর মানুষ যেমন ক্ষমতাসীন এ ডি এম কে সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, তেমনই এ ডি এম কে-বিজেপি জোটকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। পাশাপাশি টি টি ভি দিনাকরণের এ এম এম কে এবং অভিনেতা কমল হাসানের এম এন এম-এর নেতৃত্বে আরও দুটি জোট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও লড়াইয়ে তারা দাগ কাটতে পারেনি।

পুদুচেরি বিধানসভার ৩০টি আসনের মধ্যে এন আর কংগ্রেস জোট ১৬টি আসনে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জোট (এস ডি এ) ৯টি আসনে জয়ী হয়েছে। ৫টি আসনে নির্দল প্রার্থীরা জিতেছেন।

আসামের ১২৬টি আসনের মধ্যে ৭৫টিতে বি জে পি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোট জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট পেয়েছে ৫০টি আসন। এই জোটের মধ্যে বামপন্থীরাও আছে। সি পি আই (এম) ১টি আসনে জয়ী হয়েছে। প্রায় দেড় দশক পরে বামপন্থীরা আবার জয়ী হলো।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কেরালায় এল ডি এফ-র ঐতিহাসিক জয়

কেরালায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলো সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এল. ডি. এফ)। ২০১৬ এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরপর জয়ী হয়ে কেরালার নির্বাচনী ইতিহাসে নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করল এল ডি এফ। ১৯৮০ সালের পরবর্তী ৪০ বছরে কেরালার বিধানসভা নির্বাচনে এই ঘটনা প্রথম। ১৪০ আসন বিশিষ্ট কেরালা বিধানসভায় ৯৯টি আসন পেয়েছে এল ডি এফ। এই আসন সংখ্যা গতবারের চেয়ে ৮টি বেশি। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউ ডি এফ) পেয়েছে ৪১টি আসন। গতবারের চেয়ে তাদের আসন সংখ্যা কমেছে ৭টি। নির্বাচনে বি জে পি-র ভরাডুবি ঘটেছে। বি জে পি কোনো আসনে জিততে পারেনি। গতবারের জেতা একমাত্র আসনেও তারা এবার পরাজিত হয়েছে। এই নির্বাচনী ফলের মধ্য দিয়ে কেরালাই দেশের মধ্যে প্রথম বি জে পি শূন্য বিধানসভা হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, গত ৬ এপ্রিল এক দফায় কেরালায় সমস্ত আসনে ভোটগ্রহণ হয়। ভোটের হার ছিল ৭৪.২ শতাংশ। গত ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের থেকে ২.৮ শতাংশ ভোট কম পড়েছে।

একটি বিদায়ী সরকারের নির্বাচিত হবার ঘটনা চার দশক পর কেরালায় ঘটল। গত নির্বাচনের তুলনায় এল ডি এফ-র ফল ভালো হয়েছে। এল ডি এফ-র বিকল্প নীতি নিয়ে অগ্রসর হওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যেভাবে সরকার মোকাবিলা করেছে, অতিমারি এবং তার পরবর্তী ঘটনাসমূহকে যেভাবে সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে, সরকারের কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কেরালা সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমন্বয় সূচক চরিত্রকে রক্ষা করতে সরকারের ভূমিকা এবং সর্বোপরি বিদায়ী সরকারের কাজের ওপর কেরালার জনগণ ভোট দিয়েছে। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয় এল ডি এফ-র এই জয়কে কেরালার জনগণের জয় বলে বর্ণনা করেছেন। এল ডি এফ-র ওপর পুনরায় আস্থা স্থাপন করার জন্য কেরালার জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন, এখন আমাদের প্রয়োজন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই অতিমারিকে মোকাবিলা করা এবং উন্নয়ন, কল্যাণ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পথে কেরালাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এল. ডি. এফ-র ৯৯টি আসনের মধ্যে সিপিআই(এম) একাই পেয়েছে ৬২টি আসন এবং সিপিআই(এম) সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা ৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। সিপিআই(এম) ৪টি বেশি আসন পেয়েছে ২০১৬-র নির্বাচনের তুলনায়। এল. ডি. এফ-র অন্য শরিকদের মধ্যে সিপিআই ১৭টি, কেরালা কংগ্রেস (মানি) ১টি, কেরালা কংগ্রেস ২টি, এনসিপি ২টি, জনতা দল (ধর্মনিরপেক্ষ) ২টি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগ ১টি,

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

পশ্চিমবঙ্গ

পুনরায় নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস

দীর্ঘতম প্রক্রিয়ার (৮ দফা) মধ্য দিয়ে সম্প্রতি সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে পুনরায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে মোট ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে, ২৯১টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ৩টি আসনে প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। ২৯১টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ২১৩টি আসনে। মোট প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৪৯ শতাংশ ভোট গেছে জয়ী দলের ঝুলিতে। প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ তাদের সমর্থন করেছেন। কিন্তু এত সাফল্যের মধ্যেও একটি কাঁটা হল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয়।

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ধারাবাহিক প্রচার করে গেছে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ মাধ্যমের বড় অংশ। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এই রাজ্য থেকে ১৮টি আসনে জয়ী হওয়ার পর, এই প্রচার আরও তীব্রতা লাভ করে। বি জে পি-কে সরকার গঠনের দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যদি এই সংগঠিত মিডিয়া প্রচারের একটি অভিমুখ হয়, তাহলে তার অভিমুখটি ছিল প্রথমে বামফ্রন্ট এবং পরবর্তী পর্বে বামফ্রন্ট, জাতীয় কংগ্রেস ও আই এস এফ-র সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংযুক্ত মোর্চাকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে দেগে দেওয়া। মিডিয়ার এই প্রচার কৌশল অনেকাংশেই সফল হয়েছে। কারণ রাজ্য রাজনীতিতে এযাবৎকাল সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় সাম্প্রদায়িক দল বি জে পি ৭৭টি আসনে জয়ী হয়ে, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শতাংশের বিচারে ৩৮ শতাংশ ভোটদাতার সমর্থন পেয়েছে এই দল। গত লোকসভা নির্বাচনে বি জে পি পেয়েছিল ৩৯ শতাংশ ভোট এবং ১২১ টি বিধানসভা কেন্দ্রে তারা সর্বাধিক ভোট পেয়েছিল। তুলনামূলক বিচার করলে একথা বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ তাবড় তাবড় নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রচার মেশিনারি এবং সংবাদ মাধ্যমের একাংশের যোগ্য সহায়তা সত্ত্বেও, লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় বি জে পি তার সমর্থন বৃদ্ধি করতে পারেনি। বরং সামান্য হলেও কমেছে। অধরা থেকে গেছে, তাদের রাজ্য জয়ের স্বপ্ন। বি জে পি-কে ক্ষমতার মসনদ থেকে দূরে রাখতে পারা, রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে স্বস্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ৩৮ শতাংশ ভোট, প্রায় দু’কোটি বিশ লক্ষ মানুষের সমর্থন ও ৭৭টি আসন নিয়ে তারা ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চাষের জমিটাকে অনেকটাই উর্বর করে নিতে পারল। যা নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান এই বাংলার বুকে অশনি সংকেত।

সপ্তদশ নির্বাচনী ফলাফলের অভূতপূর্ব আর একটি দিক হল, বামফ্রন্ট ও জাতীয় কংগ্রেসের আসন সংখ্যা শূন্যে নেমে আসা।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

বর্তমান সময়ে মে দিবসের তাৎপর্য

প্রণব কর

১৮৮৬ সালের ১ মে সারা আমেরিকা জুড়ে শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট করেছিল কাজের সময় ১২ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টাতে কমিয়ে আনতে। তাকে কেন্দ্র করে ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেটে পুলিশের গুলি চালানো, চার জন শ্রমিক নেতার ফাঁসি, শ্রমজীবীদের আন্দোলনকে এক উত্তুঙ্গ চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল। ১৮৩৯ সালে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের জুরিখ কংগ্রেস থেকে শ্রমিকদের জন্য ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম ও ৮ ঘণ্টা মনোরঞ্জনের দাবির সপক্ষে প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রতি বছর ১ মে আন্তর্জাতিক 'শ্রমিক সংহতি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সূচনা থেকেই মে-দিবসের বৈপ্লবিক তাৎপর্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে একে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে একটি সংস্কারপন্থী আন্দোলন হিসেবে প্রতিভাত করবার তীব্র প্রচেষ্টা জারি আছে। তাই মে দিবস সংস্কারপন্থীদের কাছে আসলে শুধুমাত্র একটি কাজের সময় কমানোর আন্দোলন, কিন্তু মে দিবস আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লড়াইয়ের শপথ নেবার দিন। প্রতি বছরই মে দিবস পরিস্থিতির উপযোগী সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক পাঠায়। এই প্রেক্ষাপটেই বর্তমান সময়ে মে দিবসের তাৎপর্য বুঝতে হবে।

২০১৯ সালের শেষ থেকেই সারা বিশ্বজুড়ে কোভিড অতিমারি আগ্রাসী রূপে সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে উন্মোচিত করে দিয়েছে কোভিড অতিমারি। মুনাফা-তাড়িত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল উন্নতি হলেও তাকে মুনাফা বৃদ্ধির কাজে লাগানোর জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষ, বিশেষত দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ, বিজ্ঞানের সুফল গ্রহণ করতে পারছে না। তাই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কোভিডের টিকা আবিষ্কৃত হলেও তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনো হচ্ছে না, যাতে মুনাফা ব্যহত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে।

সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া (SII) শুধুমাত্র কোভিশিল্ড টিকা বিক্রি করেই অন্তত পক্ষে ১.১১ লক্ষ কোটি টাকা মুনাফা করবে। বেসরকারী সংস্থার মুনাফার জন্য নির্দ্বিধায় ভারতীয় সংবিধান ভাঙতে পরোয়া করছে না কেন্দ্রের বি জে পি সরকার। একই ভ্যাকসিন কেন্দ্রকে ১৫০ টাকায় এবং রাজ্যকে ৩০০ টাকায় বিক্রি করছে, যা সংবিধানের ১৪ নং এবং ২১ নং ধারার পরিপন্থী। রাজ্যের মানুষের উপর আরোপিত করের টাকা কেন ব্যবহার করা হবে একটি বেসরকারী সংস্থা থেকে দ্বিগুন দামে ভ্যাকসিন কেনার জন্য? সংবিধানের ২১নং ধারায় জীবনের অধিকারের কথা বলা আছে। স্বাস্থ্যের অধিকার, জীবনের অধিকারের অংশ। দ্বিগুন দামে রাজ্যকে ভ্যাকসিন কিনতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে এই মৌলিক অধিকারকে ভঙ্গ করা হচ্ছে। ভ্যাকসিন কোনো বিলাস দ্রব্য নয়, এটার সঙ্গে জনগণের জীবন মরণের প্রশ্ন যুক্ত আছে। তাই ভ্যাকসিন সকলেরই বিনামূল্যে পাওয়া উচিৎ।

পুঁজিবাদ এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে স্বাস্থ্য নাগরিকের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না, বরং তা কিনতে হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'স্বাস্থ্য পরিষেবা' পণ্যে পরিণত হয়। ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে তাকালেই চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

উদারীকরণের আগে ভারতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় GDP-এর ১.৩ শতাংশ খরচ হতো। বর্তমানে তা কমে দাড়িয়েছে এক শতাংশে। ২০২০ সালের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ৬২ শতাংশ বেসরকারী হাতে। নিচের তথ্য থেকে তা পরিষ্কার হচ্ছে—

বেসরকারী	সরকারী
হাসপাতাল—৪৩৪৮৬টি	হাসপাতাল—২৫,৭৭৮টি
বেড—১.৮ মিলিয়ন	বেড—৩৭,১৪,৯৮৬টি
আই.সি.ইউ—৫৯,২৬৪টি	আই.সি.ইউ—৩৫,৭০০টি
ভেন্টিলেটর—২৯,৬৩১টি	ভেন্টিলেটর—১৭,৮৫০টি

১৩০ কোটির দেশে সামগ্রিকভাবে কী অপ্রতুল এক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো।

বর্তমানে কোভিড চিকিৎসার জন্য বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হলে একদিনের গড় খরচ ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা, আর ভারতবাসীর গড় বার্ষিক আয় ১,২৬,০০০ টাকা। যদি কাউকে কোভিড চিকিৎসার জন্য ছ'দিন ভর্তি থাকতে হয় কোনো হাসপাতালে, তাহলেই তার সারা বছরের আয় নিঃশেষ হয়ে যাবে!

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে ভারত সরকারের ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনের ৯২ নং ধারা অনুযায়ী মহামারী / অতিমারীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় মেডিসিনের পেটেন্ট ভেঙে ভারত তা উৎপন্ন করতে পারে। এই ধারা তুলে দেবার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচুর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মূলত বামপন্থীদের চাপেই শেষপর্যন্ত এই ধারা বাতিল করা যায়নি। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রের বি জে পি সরকার এই ধারাকে প্রয়োগ করার পরিবর্তে অতিমারিকে প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন উৎপাদনের দায়িত্ব বেসরকারী সংস্থার উপর অর্পণ করে বসে রয়েছে। বর্তমান নয়া উদার অর্থনীতির সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি ভ্যাকসিন উৎপাদক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিকল করে রেখেছে। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে সরকারি দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা এবং তা বেসরকারীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে

সরকার। সারা বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক দেশ আমেরিকা এবং তীব্র দক্ষিণপন্থী দেশ ব্রাজিলেও একই অবস্থা। কতিপয় উন্নত পুঁজিবাদী দেশ ভ্যাকসিন উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করছে। গরিব দেশগুলিতে তারা ভ্যাকসিন পাঠানো বন্ধ রেখেছে।

অথচ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কিন্তু কোভিড অতিমারী নিয়ন্ত্রণে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে। চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা এই অতিমারী দমনে এবং সেখানকার জনগণের জীবন বাঁচাতে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেখানকার অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কিউবা সারা বিশ্বের ৫১টি দেশে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের পাঠিয়েছে, এর মধ্যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশও আছে। চীন ৫৩টি দেশে কোভিড ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে। কিউবাও ইরান, ভেনেজুয়েলা সহ অন্যান্য দেশে ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে।

এই কোভিডকালে অতিমারিকে ব্যবহার করে কেন্দ্রের বি জে পি সরকার তার নব্য উদার অর্থনীতির কার্যক্রমকে দ্রুত লাগু করে চলেছে। সংসদে একের পর এক শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী বিল এনে তাকে আইনে পরিণত করছে। তিনটি কৃষি বিলকে পাশ করানো হয়েছে, যেসব বিরোধী সাংসদরা 'ডিভিসন ভোট' দাবি করেছিলেন তাদের সাসপেন্ড করে। তিনটি লেবার কোড পাশ করানো হল এমন দিনে যখন সমস্ত বিরোধী সাংসদরা পার্লামেন্টে অনুপস্থিত ছিলেন। এই কৃষি বিলগুলি এবং লেবার কোডগুলি কৃষক-শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকারগুলিও হরণ করে নিতে চাইছে। মে দিবসের যে মূল দাবি অর্থাৎ ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিকে পদদলিত করে লেবার কোড শ্রমিকদের ১২ ঘণ্টা কাজের জন্য বাধ্য করতে চাইছে। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংঘবদ্ধ কার্যক্রমকে ধ্বংস করতে চাইছে লেবার কোড।

কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, জীবন বিমা কোম্পানীকে বেসরকারীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সামরিক উৎপাদন, রেলব্যবস্থা, টেলিকম, অসামরিক বিমান পরিবহন, বিদ্যুৎ, ইস্পাত, খনি সবকিছুই বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। এমনকি স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক পরিষেবাগুলিকেও বেসরকারীকরণের কাজ চলছে পুর্নোদ্যমে।

তিনটি কৃষি বিলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে দেশী-বিদেশী কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে হাত তুলে নেবে, চুক্তি চাষ শুরু হবে এবং খাদ্যদ্রব্যের কালোবাজারীর ব্যবস্থা পাকা হবে। এছাড়াও রেশনিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন কোটি কোটি শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়েছেন, উপার্জনহীন হয়ে পড়েছেন, দেশের জিডিপি ৭ শতাংশ কমে গেছে, তেমনি এই সময়কালে গৌতম আদানির সম্পদ দ্বিগুন হয়েছে, মুকেশ আম্বানীর সম্পদ ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুকেশ আম্বানী এই করোনাকালে বিশ্বের অষ্টম ধনীতম ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। অক্সফ্যামের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতীয় বিলিওনিয়ারদের সম্পত্তি এই অতিমারির সময়ে ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আসলে সারা বিশ্বজুড়েই বিলিওনিয়ারদের সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুলভাবে আর বেকারত্ব পৌঁছেছে বিস্ফোরক অবস্থায়—এটাই হলো অতিমারি পরিস্থিতির পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্বরূপ। সারা বিশ্বজুড়েই একদিকে পুঁজির তীব্র কেন্দ্রীভবন হচ্ছে, আর অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে—যার মধ্য দিয়ে এক তীব্র দ্বন্দ্বের সূচনা হচ্ছে পুঁজিপতি আর শ্রমজীবীদের মধ্যে।

গত বছরের লকডাউনে প্রায় ১৫ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছিলেন। এবারেও লকডাউনে তারাই মূলত বিপদগ্রস্থ। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য যে আইনটি ছিল—Inter-state Migrant Workers Act, 1979 তা বর্তমানে লেবার কোড-এ লঘুভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সামান্য যেটুকু সুযোগ-সুবিধা ছিল তাও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে নতুন লেবার কোডে। ফলে এই অসংগঠিত শ্রমজীবী অংশের উপর অতিমারি পরিস্থিতিতে নেমে এসেছে চূড়ান্ত নিপীড়ন।

সামগ্রিকভাবে মানুষ যখন এই পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন, তখন কেন্দ্রের বি জে পি সরকার তা দমন করতে ইউ. এ. পি. এ, এন এস এ ইত্যাদি আইন ব্যবহার করে আবার কখনও ইডি, আই ডি, সি. বি. আই-কে ব্যবহার করে হাজারে হাজারে ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিক, জনঅধিকার কর্মীকে জেলে পুরছে। সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে কুক্ষিগত করে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

একই সঙ্গে আমাদের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তীতে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। বিধানসভায় তৃণমূল আর বি জে পি মিলিতভাবে ২৯০টি আসন (২১৩.৭৭) পেয়েছে এবং ৮৭.০৭ শতাংশ ভোট (৪৭.৯৭+৩৮.১৩) পেয়েছে। সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে একমাত্র প্রতিনিধি আই. এস. এফ-এর নৌসাদ সিদ্দিকি। এর মধ্য দিয়ে এক তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এই রাজ্যে। মানুষের জীবন-জীবিকার বিষয়গুলি যাতে রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি না হয়ে উঠতে পারে তার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা হবে।

আবার এই সময়কালে দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীরজুড়ে তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে লাতিন আমেরিকা, প্যালেস্টাইন, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সামরিক মহড়া চালাচ্ছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের কোনো অনুমতি না নিয়েই আমেরিকার সেভেন্থ ফ্লিট (Seventh Fleet) যুদ্ধ জাহাজ লাক্ষাদ্বীপ উপকূলবর্তী Exclusive Economic Zone (EEZ)-এ জোর করে প্রবেশ করে, যা ভারতের সার্বভৌমত্বকেই চ্যালেঞ্জ করে। বলিভিয়াতে ইভো মোরালেসের নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যদিও পরবর্তীতে ইভো মোরালেসের এম এ এস পার্টি আবারও নির্বাচিত হয়। ভেনেজুয়েলায় মাদুরো সরকারকে ফেলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। ইস্রায়েলের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে আক্রমণ চালিয়ে মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলে অনবরত অস্থিরতা তৈরি করে চলেছে।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই আমাদের বর্তমান সময়ে মে দিবসের তাৎপর্য বুঝতে হবে। মে দিবসের লড়াই যেহেতু পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লড়াই, তাই আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণ করে যে শক্তিগুলি পুঁজিবাদের বিপক্ষে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে কাজ করছে তাদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে।

তাই এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

অতিমারি পরিস্থিতিতে কোটি কোটি কর্মচ্যুত মানুষের বেঁচে থাকা সুনিশ্চিত করতে আয়কর দেয় না এমন পরিবারকে প্রতি মাসে ৭,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে এবং জনপ্রতি প্রতি মাসে ১০ কেজি করে খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দিতে হবে।

অতিমারির হাত থেকে দেশের জনগণকে বাঁচাতে বিনামূল্যে সর্বজনীন টিকার ব্যবস্থা করতে হবে। টিকা নিয়ে কোনো ব্যবসা করা চলবে না। একই সঙ্গে সারা দেশজুড়ে সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

অতিমারির বাহানা দিয়ে মানুষের প্রতিবাদ, জমায়েত, প্রতিরোধকে নিষিদ্ধ করে একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে জলের দরে বেচা, তিনটি কৃষি বিলকে আইনে পরিণত করা, তিনি লেবার কোডকে সংসদে পাশ করানো, দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিপতিদের কাছে বন্ধক রাখা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্জলী যাত্রা করানো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা—এসবই করে চলেছে বি জে পি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র কিছু দেশী ও বিদেশী কর্পোরেট সংস্থার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য। এই সমস্ত আক্রমণগুলি একই সূত্রে বাধা, কোনোটাই বিচ্ছিন্ন নয়। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকের নেতৃত্বে দেশের মেহনতী মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এই প্রতিরোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য। সমসাময়িককালে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলিতে কৃষকদের দৃঢ় সমর্থন এবং কৃষকদের আন্দোলনে ও ধর্মঘটে শ্রমিকদের দৃঢ় সমর্থন আন্দোলনগুলির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই মে দিবস আমাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে শ্রমিক-কৃষক একতাকে দৃঢ় করে সামগ্রিক মেহনতী মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সমস্ত ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করতে হবে। একমাত্র এর মাধ্যমে নব্য উদার অর্থনীতি এবং সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম এক উন্নততর স্তরে পৌঁছেবে।

রাজ্যে যে তীব্র সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাকে পরাস্ত করতে শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে লড়াইকে রাজনীতির সামনের সারিতে নিয়ে আসতে হবে। একমাত্র তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলেই বিভেদমূলক সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। বর্তমান সময়ে মে দিবস এই সংগ্রামের সঙ্গেই সংপৃক্ত হতে আহ্বান জানাচ্ছে। □

কোভিড পরিস্থিতি— বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য

কুমকুম মিত্র

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্যের যে সংজ্ঞা ঠিক করেছে তা কেবলমাত্র রোগহীনতা ও পঙ্গুত্বহীনতাই নয়, বরং শারিরীক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ভালো থাকা। সুস্বাস্থ্য অর্জন করাই যেখানে প্রত্যেক মানুষের প্রাথমিক লক্ষ্য, রোগ প্রতিরোধ সেখানে একেবারে প্রাথমিক চাহিদা। এই চাহিদাটি পূরণ করতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ ও জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের যেমন ভূমিকা থাকে, তেমনি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাষ্ট্রের। আইনসভা, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন ও চতুর্থস্তম্ভ মিডিয়াসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তম্ভের নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে এই ক্ষেত্রে। জনসাধারণের অংশগ্রহণের সাথে সাথে এই প্রতিটি স্তম্ভ, বিশেষত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সহ সবক'টি দপ্তরের নিবিড় ও সুসংসহত সমন্বয়েই গড়ে উঠতে পারে একটা কার্যকরী, শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা। এর ফলে বিভিন্ন মারণ রোগসহ অতিমারিকেও মোকাবিলা করে জনগণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে।

দুর্ভিক্ষ-মহামারীর মতো অজস্র কাহিনী বর্ণনার নজির ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতা, স্মৃতিকথায় বা গল্প উপন্যাসে। অতীতে যখন কলেরা, বসন্ত, যক্ষা, ম্যালেরিয়ার কোনো টিকা আবিষ্কার হয়নি, কোনো চিকিৎসা বা ওষুধ ছিল না, তখন মাঝেমধ্যেই এইসব রোগ ছড়িয়ে মহামারীর আকার নিত। উজার হয়ে যেত গ্রামের পর গ্রাম। অসহায় মানুষ মৃত্যুভয়ে বাঁচার আশায় পালিয়ে যেত ঘর-বাড়ি গ্রাম ছেড়ে। রোগীর সেবা তো দূরের কথা, মৃতের শেষকৃত্যর জন্যও কোনো লোক পাওয়া যেত না। ফলে ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে পড়ে থাকতো মৃতদেহ। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত শেয়াল কুকুরে। আজ আবার যেন সেই ইতিহাস ফিরে ফিরে আসছে। অতীতের সেই কাহিনীর বর্ণনাগুলিই যেন নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

এখনো চলছে তেমনই মহামারি, মানুষ তেমনই অসহায়। প্রিয়জনের মকৃতদেহের মর্যাদা দিয়ে শেষকৃত্য করার সুযোগ নেই আগের মতোই। অথচ মাঝখানে কেটে গেছে দেড়-দুশো বছর। বর্তমান সময়ে মানবসভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আবিষ্কার অসংখ্য সমস্যার সমাধান করেছে। মানুষের প্রতিদিনের জীবনকে অনেক সহজ ও আরামদায়ক করেছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। কিন্তু এত কিছু পরেও মানুষের অসহায়তা যে কমেনি তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলো আজকের করোনা অতিমারি। আর যেটা প্রকটভাবে সামনে চলে আসছে তা হলো, শাসকের চরিত্রও বিশেষ বদলায়নি। তেমনই সম্পদের অসম বণ্টনের ধারারও কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং আগের থেকে অনেক বেড়েছে। অতীতে মহামারীর কোপে পড়ে সর্বাধিক ক্ষতি স্বীকার করতো গরিব মানুষ, আজও তাই। অতীতের মতোই মহামারি থেকে বাঁচার রসদ বা উপকরণ গরিব মানুষের নাগালে নেই। তাই অক্সিজেনের এই আকালে যার টাকা আছে ও ক্ষমতার সান্নিধ্য আছে তিনিই অক্সিজেন জোগার করতে পারবেন, সাধারণ মানুষ হবে বঞ্চিত।

যতই দিন যাচ্ছে কোভিড পরিস্থিতি আমাদের দেশ ও রাজ্যে ততোই কঠিন রূপ ধারণ করছে, এরপর আবার তৃতীয় তরঙ্গ আসবে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না গোটা ভারতবর্ষ। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ দেশের মানুষকে এক শ্বাসরোধকারী অবস্থার মধ্যে টেনে এনেছে। আমাদের একটা মস্ত সুবিধাজনক অবস্থা ছিল এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশে এই অতিমারির ঢেউ আছরে পড়ার বেশ কিছু সময় পরে তা আমাদের দেশে আসে। তাই দেশের শাসকবর্গ সহ সাধারণ মানুষও কিছুটা সময় পেয়েছিলাম তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে অন্যান্য দেশ কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জেনে নিজেদের প্রস্তুত করার। কিন্তু এই সুবিধাজনক অবস্থার সদ্ব্যবহার রাষ্ট্রচালকরা করতে পারেননি। প্রথম ঢেউ কমে যাওয়ার পরের মূল্যবান সময়টা সরকার কাজে লাগাতে না পারার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে করোনা ভাইরাস নিজেকে পরিবর্তীত করে নতুন প্রকরণ নিয়ে বাজার দখলে সচেষ্ট হয়ে গেল।

পরিবর্তীত করোনা ভাইরাস নিজেকে বিকশিত করার আরও সুযোগ পেল যখন জনসাধারণও তিনটি অবশ্য পালনীয় সতর্কবানী শিকেয় তুলে দিয়েছিল। কারণ পর্যায়ক্রমে আনলক প্রক্রিয়া আমাদের লাগাম ছাড়া করে তুলেছিল। সামাজিক অনুষ্ঠান, জমায়েত, মিছিল, মিটিং সব শুরু হয়ে গেল মাস্ক ব্যবহার ও শারিরীক দূরত্ব বজায় রাখা ছাড়াই। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছিলেন "আমরা করোনাকে বিতাড়িত করতে পেরেছি"। স্বাভাবিকভাবেই সরকার যখন বেপরোয়া তখন সাধারণ মানুষের আর পরোয়া কী? ইতিমধ্যে শুরু হলো টিকাকরণ, মানুষ আরোই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু চিকিৎসক সমাজ থেকে বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা জারি ছিল যে দ্বিতীয় ঢেউ আরো ভয়ানকভাবে হাজির হবে, তবুও কারোর কোনো হুঁস ছিল না। অন্যান্য সমস্ত দেশে করোনা মোকাবিলার জন্য ভ্যাকসিন, অক্সিজেন স্টক করেছে, তখন আমাদের দেশের শাসকরা করোনাকে বিতাড়িত করেছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। আসলে কোনোরকম পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের সদিচ্ছা না থাকার জন্যই দেশবাসীর এই চরম দুর্ভোগ। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ না মেনে সিদ্ধান্ত নেয় অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটাতে। সেই মোতাবেক থালা-কাঁসর ঘণ্টা বাজানো, দীপ জ্বালানো, আতশবাজির রোশনাইয়ে উদ্ভাসিত হওয়া, 'ভাবিজি' পাঁপড় খাওয়া, ফুল ছড়ানো, রোদে শুকনো হওয়া, এমনকি গোমূত্র-গোবরের শক্তিশালী পাচকও বহু মানুষ অন্ধ বিশ্বাসে খেয়েছে, তবুও করোনার আক্রমন ঠেকাতে পারেনি। গত ৮ মার্চ '২১ দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সতর্কবানীকে ডাস্টবিনে ফেলে বিশ্ববাসীকে গর্বের সাথে শুনিয়েছিলেন—"আমরা অতিমারির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।" স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে তুড়ি মেরে ও সরকারের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত ব্যর্থ প্রমাণ করে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কেড়ে নিল হাজার হাজার প্রাণ। এই সময় আবার চলে আসে বিধানসভা নির্বাচন। সারা দেশজুড়ে করোনা হাহাকারের মধ্যেও রাষ্ট্রনেতারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাজ্য দখলের লড়াইয়ে। দেশজুড়ে নেমে এলো চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। কেন্দ্র ও রাজ্য কার্যত যেন অতিমারির কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। সবাই নির্বিচারে মাস্ক ছাড়াই নেমে পড়লো সমাবেশ, মিটিং, মিছিলে আর করোনাও হু হু করে ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। এর জন্য একমাত্র দায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাহীন সিদ্ধান্ত। যদি ৮ ফেব্রুয়ারি '২১ করোনার প্রথম ঢেউয়ের শেষ পর্যায় ধরা যায়, তাহলে ঐদিন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৯০ জন ও মোট মৃত্যু ছিল ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৯৫ জনের। আর দ্বিতীয় ঢেউয়ে শুধুমাত্র ৯ ফেব্রুয়ারি '২১ থেকে ১৬ মার্চ ২১ এই স্বল্প সময়েই আক্রান্তর সংখ্যা সরকারী হিসাবে ১ কোটি ১৪ লক্ষ ১১৭ হাজার ৬৭৩ জন এবং মৃত্যু হয় ১ লক্ষ ১৯ হাজার ২১৬ জনের। বেসরকারী হিসাব ধরলে আরো বহু গুন বৃদ্ধি পাবে এই সংখ্যা। এই সময়ের মৃত্যু মিছিলের গণদাহ বা গণকবর হয়েছে। কখনো বা শ'য়ে শ'য়ে লাশ গঙ্গার জলে ভেসেছে আবার কোথাও সমুদ্রতটেই বালি চাপা দিতে হয়েছে বহু লাশের, কারণ শ্মশান বা কবরস্থান কোথাও জায়গা নেই। এই হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক দৃশ্য রাষ্ট্র বা রাজ্য শাসকদের হৃদয় ভেজাতে পারেনি, তাঁরা তখন ব্যস্ত গদি দখলে রাখার খেলায়। কোটি কোটি টাকা খরচ করে দিল দুই শাসকদল গদির লড়াইয়ে, অথচ করোনা মোকাবিলায় যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রয়োজন সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। নির্বাচনী সমাবেশ, প্রচার ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে এ রাজ্যে লোক আসতে লাগলো, কোথাও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার চিহ্নমাত্র দেখা যায়নি, বা মাস্ক ব্যবহার করার। শারিরীক দূরত্ব বজায় রাখা যেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তরপ্রদেশে বি জে পি সরকার এলাহাবাদে কুম্ভ মেলার ছাড়পত্র খুব সহজেই দিয়ে দিল। করোনার বিধিনিষেধ না মেনেই লক্ষ লক্ষ সাধু / মানুষের সমাগম দ্বিতীয় ঢেউকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল।

করোনা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় হলো উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ, সকলের জন্য বিনামূল্যে দুই ডোজের ভ্যাকসিনের জন্য যখন বেশি করে অর্থ বরাদ্দ করার প্রয়োজন, তখন রাষ্ট্র শাসকরা গায়ত্রী মন্ত্র গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ করছেন। রাষ্ট্র পরিচালকদের মিটিং করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করছেন। ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে গৃহহীন রাষ্ট্র নেতার মাথার ছাদ তৈরির জন্য। সংসদ ভবন নতুনভাবে নির্মাণের জন্যও এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। অথচ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর এত অবনতি তাঁদের দৃষ্টিগোচরে নেই। হাসপাতালগুলিতে বেডের অভাব, অক্সিজেনের অভাব, পর্যাপ্ত ভেন্টিলেটর নেই, পর্যাপ্ত ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট নেই, সব মিলিয়ে এত বিশৃঙ্খলা অবস্থা আর শাসকবর্গ চোখে ঠুলি দিয়ে আছে। সমস্ত দুর্ভোগ সামলাতে হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীদের। সাধারণ মানুষকে আজ সবই কিনতে হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি হতে গেলে একটা বেড পাওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা দিতে হচ্ছে, অনেক সময় তাও বেড পাচ্ছে না। অক্সিজেনের অভাবে রোগী মারা যাচ্ছে, কখনো বা অক্সিজেনের একটা নলেই একাধিক রোগী কিছুক্ষণ করে ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে, কেউ বা তাও পাচ্ছে না, অক্সিজেনের রেগুলেটরও কিনে নিতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে করোনা প্রতিযেধক টিকাও কারণ সরকারীভাবে সরবরাহ অপর্যাপ্ত। কেন্দ্র সরকার ঘোষণা করেছিল ১লা মে '২১ থেকে ১৮ বছর থেকেই প্রতিযেধক টিকা দেওয়া হবে, কিন্তু কার্যত তা সম্ভব হয়নি টাকার অভাবে। প্রথমে শুরু হয় ৬০ বছরের উর্ধ্বে, তারপর ৪৫ বছর থেকে পরে ১৮ বছর তদুর্ধ্ব। পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশে ১৮-৪৫ বছরের জনসংখ্যা ৮০-৯০ কোটি। সকলকে দুটি ডোজ ভ্যাকসিন দিতে হলে প্রয়োজন ১৬০-১৮০ কোটি ডোজ। কিন্তু ভারতে সবমিলিয়ে প্রতি মাসে ৭-৮ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন তৈরি হয়। আবার এই উৎপাদনের একটা বড় অংশ আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে মহান সাজানোর জন্য চুক্তি অনুযায়ী বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভ্যাকসিনের দাম নির্ধারণ। সম্প্রতি তিন ধরনের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সিরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি 'কোভিশিল্ড'-এর দাম কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য ডোজ প্রতি ১৫০ টাকা, রাজ্য সরকারের জন্য ডোজ প্রতি ৪০০ টাকা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ডোজ প্রতি ৬০০ টাকা। ভারত বায়োটেকের তৈরি 'কোভ্যাক্সিন'-এর দাম কেন্দ্রের জন্য ডোজ প্রতি ১৫০ টাকা, রাজ্য সরকারের ডোজ প্রতি ৬০০ টাকা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ডোজ প্রতি ১২০০ টাকা। যেখানে ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনকি বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কাও তাদের দেশবাসীকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশে হবে না কেন? প্রসঙ্গত আমরা দেখেছি অতীতে বিনামূল্যে টিকাকরণ করে গুটিবসন্ত দূর হয়েছে (শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে)। পোলিও দূর করা সম্ভব হয়েছে মনমোহন সিং-এর আমলে। তাহলে করোনা অতিমারির সময়ে ভিন্ন ব্যবস্থা কেন? আমাদের সকলেরই দাবি—"সকলের জন্য বিনামূল্যে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে"। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব সহ অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির নেতৃত্বরাও এই লকডাউনের মধ্যে ঘরে বসে, কেউবা কর্মরত অবস্থাতেও হাতে লেখা পোস্টারের মাধ্যমে এই দাবিতে সোচ্চার হয়ে সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।

রাজ্যের ক্ষেত্রেও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ খুবই ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে, এই ভয়াবহ অবস্থায় করোনা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ রাজ্য সরকার। এখানেও বিশৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্য সমানতালে বিরাজমান। প্রশাসন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে সরকারি স্তরে পরিসংখ্যান চেপে রাখার চেষ্টা করছে, তার ফলে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যাও বহাল আছে। প্রথম ঢেউয়ে গ্রামবাংলায় ততোটা প্রভাব না পড়লেও এই দ্বিতীয় ঢেউ গ্রামবালাংকে যে কিভাবে প্লাবিত করছে তা আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি, যেহেতুক আমিও সরাসরি স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্লকস্তরে কাজের সাথে যুক্ত আছি। করোনা মোকাবিলায় তিনটি 'T' এর গুরুত্ব অপরিসীম (Trace, Test & Treatment) অর্থাৎ খুঁজতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে এবং চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণেই এত মৃত্যু হচ্ছে। আমরা দেখেছিপ্রয়োজনের তুলনায় বেড নগন্য, অক্সিজেন সরবরাহ কম। অথচ একসাথে বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে প্রশাসনিক স্তরে পরামর্শ দেওয়ার কেউ নেই, কোনো নজরদারির ব্যবস্থাও নেই। পুরো ব্যবস্থায় একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা।

কোভিড টেস্ট নিয়ে রাজ্যে চলছে তুমুল নৈরাজ্য। আক্রান্ত ও মৃত্যুহার কমাতে গেলে যেখানে বেশি করে পরীক্ষা-রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন, সেখানে দিনে দিনে পরীক্ষার জন্য কিট সরবরাহ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে পরীক্ষাও কম হচ্ছে এবং পজিটিভ রুগীও কম চিহ্নিত হচ্ছে। আর প্রশাসন গর্ব করে বলে যাচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে ও দেখতে পাচ্ছি গ্রামেগঞ্জে পরীক্ষা না হওয়ায় অনেকেই করোনার লক্ষ্মণ সহ আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। এগুলি কোনো সরকারী পরিসংখ্যানে উঠছে না এবং মারাত্মক বিষয় হলো যেহেতুক পরীক্ষা না হওয়ায় তারা জানলোই না যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে, তাদের মাধ্যমেই ভাইরাস আরো ছড়িয়ে যাচ্ছে। করোনা আবহে ওষুধ-অক্সিজেন নিয়ে যেমন কালোবাজারি চলছে, তেমনি বাড়ছে করোনা পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণার ঘটনা। অনলাইনে ফাঁদ পেতে চলছে অসাধু কারবার। রমরম করে চলছে ভুয়ো করোনা রিপোর্ট তৈরির চক্র। কিভাবে এই প্রতারকদের কাছে রিপোর্টের ফাঁকা ফরম, টেস্টিং কিট, ভ্যাকসিনের শিশি, সিরিঞ্জ, পিপিই ইত্যাদি যাচ্ছে তা নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠছে রাজ্যে। এসব একদম প্রশাসনের অজানা সেটা হতে পারে না।

২৯/৫/২১ পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংক্যা ২৪ ঘণ্টায় ১২,১৯৩ জন (সরকারী হিসাবে) এবং মৃত্যু ১৪৫ জনের। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে রাজ্যজুড়ে আক্রান্তরা বেড পাওয়ার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে এই দৃশ্য আমরা প্রতিদিনই সমস্ত মিডিয়াতে দেখতে পাই,। এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি ৬০ শতাংশ বেড খালি আছে, তাহলে কেন আক্রান্তদের নিয়ে তাদের বাড়ির লোকেরা ছুটে বেড়াচ্ছে? রাজ্যে কোভিড-আক্রান্তদের কাছে আরেকটি ভয়ের বিষয় হলো অক্সিজেন না পাওয়া। এই বেড ও অক্সিজেন নিয়েও চলছে দালাল ও কালোবাজারিদের রমরমা ব্যবসা, এদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কোনো পদক্ষেপ না হওয়ায় মানুষের হয়রানি বাড়ছে। বেড অক্সিজেনের জন্য দালালদের হাজার হাজার টাকা দিতে হচ্ছে। রাজ্য এখন দালাল ও কালোবাজারিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সারা দেশ ও রাজ্যজুড়ে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে চলছে আরেক খেলা। গোটা বিশ্বে একমাত্র টিকাকরণ এই অতিমারি থেকে রক্ষা করতে পারে—এটাই ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতামত। যদিও ভ্যাকসিন দুই ডোজ নিলেই যে আর করোনায় আক্রান্ত হবে না, এ ধারণা ভ্রান্ত। ভ্যাকসিন নিলেও করোনা হতে পারে, তবে মারাত্মক আকার নেবে না। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পছন্দের দুটি কর্পোরেট সংস্থাকে যথেচ্ছ মুনাফার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ভ্যাকসিন তৈরির ছাড়পত্র দেয়। কিন্তু মাত্র দুটি কোম্পানিতে যা তৈরি হয় তা সবাইকে দুটি ডোজ দেওয়ার জন্য খুবই কম। অতএব ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ যারা নিচ্ছেন (সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮ বছর ও তদুর্ধ্ব) তারা দ্বিতীয় ডোজ কবে পাবেন তার কোনো ঠিক নেই। প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল ২৮ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ হবে, যা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে, পরে সেটা হলো ৪২-৪৫ দিনের মধ্যে এবং এখন হয়েছে ৮৪ দিন পরে। এই গ্যাপের জন্য কিন্তু জোরালো কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। আমাদের রাজ্যের কর্ণধার ভ্যাকসিন নিয়ে যে দ্বিচারিতা করছেন তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। তিনি ঘোষণা করেছিলেন তিন মাসের মধ্যে রাজ্যবাসীর টিকাকরণ সম্পূর্ণ করবেন। তিনি পাবেন না এটা জেনে বুঝেই রাজ্যের জন্য কেন্দ্রের কাছে ৮ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন চেয়েছেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, অথচ প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তার কোনো উল্লেখ নেই। তিনি চিঠি দিয়েছেন ৩ কোটি ডোজ ভ্যাকসিনের জন্য এবং ১৭ লক্ষ ডোজ ভ্যাকসিন কেনার টাকা দিয়েছেন। কেন এই প্রতারণা তিনি রাজ্যবাসীর সাথে করছেন? আবার রাজ্যে কোভিড ভ্যাকসিন প্রথম ডোজের জন্য যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতেও স্বজনপোষণের খেলা চলছে। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী হকার, পরিবহন কর্মী ও মিডিয়ার কর্মচারীদের লিস্ট পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস থেকে হাসপাতালে আসবে ও সেই অনুযায়ী দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যারা লাইনে আছে লিস্টে তাদের নাম নেই। পঞ্চায়েত স্তর থেকে তাদের পছন্দ মতো মানুষকে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে হাসপাতালের কর্মচারীদের সাথে ভুল বোঝাবুঝি ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে আধার কার্ড অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সই হয়নি অথচ তাদের পাঠানো হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে দিতেই হবে। এইরকম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে স্বাস্থ্য কর্মীদের কাজ করতে হচ্ছে। এই সময়ে আরেকটি সমস্যা দেখা দিচ্ছে—'করোনা বিমা' নিয়ে হেনস্থা। করোনা বিমার যে ঘোষণা সরকার করেছিল দেখা যাচ্ছে মাঝারি ও ছোটো মাপের বহু বেসরকারী হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে করোনা রোগীরা 'ক্যাশ লেস' পরিষেবা পাচ্ছেন না। বিমা সংস্থার তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক হাসপাতাল প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছে, এই সময়ে তাদের পক্ষে রোগী ভর্তি নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তারা ঐ টাকা পাচ্ছেন না, ফলে তাদের ক্ষতি হচ্ছে। নগদ টাকা দিয়ে চিকিৎসা করাতে রাজী থাকলে তবেই ভর্তি নেওয়া হবে। রোগীরা ও তাদের পরিবার অসহায় পড়ে পড়েছে।

এতসব সত্ত্বেও অসম লড়াই চালাচ্ছে ক্লান্ত অবসন্ন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা, তারাও প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছেন এমনকি এপর্যন্ত বহু জনের মৃত্যুও হয়েছে। অথচ তাদের কোনো আর্থিক সহায়তা নেই। ইনটেন্সিভ নেই, ইনসিওরেন্স নেই। প্রথম দফারই বিপুল বকেয়া পড়ে আছে।

এছাড়াও দফায় দফায় লকডাউন ও আনলকের ফলেও রাজ্যবাসী বিশেষত শ্রমিক-কর্মচারীরা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা রাজ্যবাসী আবারও তালাবন্দী, কতদিন চলবে কেউ জানে না। এই অপরিকল্পিত পথে সংক্রমণের শৃঙ্খল আদতে ভাঙবে কিনা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দুঃসহ স্মৃতি উসকে, জীবন-জীবিকা হারিয়ে, আবার ভয়ঙ্কর জোড়া বিপদে প্রান্তিক মানুষ। একদিকে ভাইরাস, অন্যদিকে পেটের আগুন। এর থেকে মুক্তি মিলবে তখনই, যখন সরকার পরিকল্পিতভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগী হবে ও বাস্তবে রূপায়ন করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে করোনার তৃতীয় ঢেউ আরও ভয়ানক রূপ নিয়ে আসতে চলেছে। সরকার ও রাজ্যবাসী যদি আগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে করোনা মোকাবিলার

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

সাধারণ সম্পাদকের আবেদন

শোণিত। তাই শুরু হয়েছে লড়াই আবারও। আবারও চলার পথের দুধারে গড়ে উঠছে ত্যাগ ও তিতিক্ষার স্মারক। আবারও শাসকের চোখে চোখ রেখে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস দেখাচ্ছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

কোনো সন্দেহ নেই, সংগ্রামী ভূমিকার এই বহমান ট্রাডিশনের মূল শক্তির উৎস কর্মচারী সমাজ। সংগঠন দেহের প্রতিটি কোষে ভালোবাসা ও আস্থার অক্সিজেন সরবরাহ করে এক চলমান ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়েছেন কর্মচারী বন্ধুরা। যখনই সংগঠন তার জীবনীশক্তিকে অব্যাহত রাখার জন্য, তার বহুমাত্রিক দায়িত্ব প্রতি পালনের জন্য সাহায্যের আবেদন করেছে, স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছেন কর্মচারীরা। এমনকি গত বছর লকডাউনের সময়েও, সংগঠন অসহায় মানুষের পাশ দাঁড়াতে চায়, এই বার্তাটুকু প্রচারিত হতেই বিপুল সাড়া দিয়েছেন কর্মচারীবন্ধুরা। আনন্দে, গর্বে আপ্লুত হয়েছে সংগঠন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজ্যের কর্মচারী সমাজ ও সংগঠনের নিবীড় আন্তঃসম্পর্কের মূল রসায়নটি কী? এর উত্তরে বলা যায়, সর্বস্তরের কর্মচারী বন্ধুদের একটি সমউপলব্ধি। এবং তা হল, যে কোনো সংগঠনের সদা সক্রিয়তায় যে সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সদা সক্রিয় সংগঠন। কর্মচারী স্বার্থ ও জনস্বার্থবাহী বিভিন্ন ইস্যুকেন্দ্রীক সংগ্রাম-আন্দোলন পরিচালনা, রাজ্যের সীমানার বাইরে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনসমূহের যৌথ মঞ্চের কর্মসূচী, বহুবিধ সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালনে ঐকান্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এই সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। স্বভাবতই বহুবিধ বহুমাত্রিক কর্মসূচী রূপায়নে প্রয়োজন হয় বিপুল অর্থের। রয়েছে রাজধানী শহর থেকে প্রত্যন্ত ব্লক পর্যন্ত বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামোকে সজীব রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খরচও। আজকের মূল্যস্তরের নিরিখে যার পরিমাণও বিপুল। সর্বোপরি রয়েছে মুখপত্র সহ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রচার কর্মসূচীর ব্যায়ভারও।

বন্ধুর থেকে বন্ধুরতর হচ্ছে চলার পথ। আরও অদম্য জেদ, অসীম সাহস ও লৌহ দৃঢ় ঐক্য ছাড়া এই প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করা অসম্ভব। আর এইসব কিছুর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সংগঠন। উপরোক্ত বিষয়গুলির ভিত্তিতে বলা যায়, শক্তিশালী সংগঠনের অপরিহার্য শর্ত হল শক্তিশালী তহবিল। আর তা সম্ভব কর্মচারী বন্ধুদের সাহায্যের মাধ্যমেই। তাই প্রত্যেক বন্ধুর কাছে আবেদন, জুলাই-আগস্ট মাসের বেতন থেকে সংগঠন তহবিলে নির্ধারিত হারে সাহায্য করুন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সমস্ত শক্তিকে সংহত করে লড়বেই আপনার স্বার্থে। এই লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই আগামী ১৫ জুলাই সারা রাজ্যে টিফিনের সময় চার দফা দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কমরেড মলয় রায়ের জীবনাবসান

করেন। বেশ কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গ কারারক্ষী সমিতির সভাপতিও ছিলেন।

কোভিড বিধির কারণে সর্বজনপ্রিয় এই প্রয়াত নেতাকে যথোচিত মর্যাদা সহকারে চিরবিদায় জানাতে না পারার আক্ষেপ নিয়েই তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সুগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি রইল সমব্যাথীর সমবেদনা।

কমরেড মলয় রায়-এর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, কমরেড মলয় রায় ছিলেন এই রাজ্য তথা সর্বভারতীয় মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলা ও বিকাশের ক্ষেত্রে কমরেড মলয় রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রশাসনের অভ্যন্তরেও একজন দক্ষ কর্মচারী হিসেবে তিনি কর্মচারীদের কাছে পরিচিত ছিলেন। সদাহাস্যময় কমরেড মলয় রায়-এর প্রয়াণে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি হারাল এক গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে। কোভিড বিধির কারণে সংগঠনের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাঁকে শেষ বিদায় জানানো গেল না, যার আক্ষেপ আমাদের চিরকাল বহন করতে হবে। কমরেড মলয় রায়ের দুই পুত্র ও তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও সমবেদনা জানান। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

তিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন

নবগঠিত রাইজর দল ও আসাম জাতীয় পরিষদ পৃথক জোট করে মাত্র একটি আসন পেয়েছে। বি জে পি এই রাজ্যে সরকার ধরে রাখতে পারলেও মহাজোট ভালো লড়াই করেছে। ১০০-র বেশি আসনের স্বপ্ন বি জে পি-র অধরাই রয়ে গেল। আগের বারের মতো এবারও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বি জে পি। বরং আগের চেয়ে আসন কমেছে বি জে পি জোটের। আসামে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বি জে পি নেতা হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এবারের নির্বাচন পর্বের সামগ্রিক ফলাফলে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জুটির দাপট কমবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই নির্বাচন বি জে পি-র অনুকূলে কোনো ইতিবাচক বার্তা দিতে পারেনি। বরং মানুষ যে বি জে পি-র থেকে দূরে সরে যেতে চাইছেন তারই বার্তা পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে করোনা অতিমারির মোকাবিলায় মোদী সরকারের সার্বিক ব্যর্থতা মানুষকে মৃত্যু মিছিলে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বি জে পি-র প্রতি মানুষের আশা-ভরসা দিনকে দিন কমছে। এটা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে বি জে পি অপ্রতিরোধ্য নয়। এর ফলে বিরোধী দলগুলির উৎসাহ ও তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। এই নির্বাচন পর্বের ফল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক চরিত্রকে রক্ষা এবং দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার লড়াই ও গণআন্দোলনকে বিকশিত করার লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে। একই সঙ্গে এই ফল উত্তরপ্রদেশের আগামী বছরের নির্বাচনে বি জে পি-কে চিন্তায় রাখবে। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

এগিয়ে নিয়ে চলুন ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’-কে

তৈরি আর তার প্রচারের কাজ। বুরকিনা ফাসোর ঘটনার ছবিকে হনলুলুর ঘটনা বলে চালানো হয়, নিকারাগুয়ার ঘটনাকে বলা হয় মায়ানমারের ঘটনা, হাঁটুজলে সাঁতার কাটিয়ে বলা হয় মানুষ সমান জল দাঁড়িয়েছে, কাঁধের ওপর ব্যাং বসয়ে প্রমাণ করা হয় জনজীবনের বিপন্নতা আর এইভাবেই নির্লজ্জের মতো মুছে ফেলা হয় সত্য-মিথ্যার যাবতীয় সীমারেখা। এভাবেই তারা সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়, জনগণের বন্ধুর ছদ্মাবরণে আসলে তারা হয়ে ওঠে জনগণের শত্রু কারণ কর্পোরেটের স্বার্থ আর জনগণের স্বার্থ কখনওই এক পাল্লায় বসতে পারে না।

পুঁজিবাদের প্রচার মাধ্যমের ভ্রষ্ট ভূমিকা আজ এমন সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি—কেউই আর নিরাপদ নয়। প্রচার মাধ্যমে এখন নীতিগত ভাবেই এমন কিছু থাকে না, যা পাঠকের মনে প্রসারতা আনে, চিন্তাকে উন্নত করে, ভাবতে বাধ্য করে, অপ্রীতিকর সত্যকে স্বীকার করতে শেখায়, জ্ঞানার্জনে উৎসাহী করে, জাগতিক ভাবে সৃষ্টিশীল করে, সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। বরং তারা এখন মানুষের মনের মধ্যে চিন্তার যে অবয়বটি গড়ে, তা সচেতন মানুষের পরিবর্তনকামী আকাঙ্খার সাথে খাপ খায় না, কর্পোরেট তাকে বাধ্য করে তাদের নিজেদের সুবিধামতো বাছাই করা অক্ষের চারপাশেই ঘুরপাক খেতে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে আজকের পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের অবসান চাইতে গেলে সমস্ত লড়াইয়ের সূচিমুখ কেন্দ্রীভূত করার দরকার পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। চোখে চোখ রেখে করার দরকার সে লড়াই। জেদী, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই ছাড়া কোনও শর্ট কাট নেই যে লড়াইয়ে জেতার জন্যে। কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও অনস্বীকার্য যে শত্রুর হাতিয়ারকে খোলা রেখে দিয়ে কখনও শত্রুকে দুর্বল করা যায় না। একদিকে তাই পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত ফাঁক-ফোকর, তাদের কলা-কৌশল, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, মতলব মানুষের সামনে মেলে ধরতে হবে, পাশাপাশি ঠিক তেমনই সমান মনোযোগ দিয়ে তাদের প্রধান হাতিয়ার সংবাদ মাধ্যমেরও যাবতীয় মিথ্যাচার ফাঁস করে দিতে হবে মানুষের কাছে। লড়াকু কোনও সংগঠনের পত্রিকা এই দুটো কাজই করার ক্ষমতা রাখে।

তাহলে সংগঠনের পত্রিকা পরিচালনার নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গী কীরকম হওয়া দরকার? লেনিন এ ব্যাপারেও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন। পাঠক ভুল বুঝবেন না। যে ধরনের সমাজে বাস করার স্বপ্ন আমরা প্রতিনিয়ত দেখি, সেই সমাজ হাতে কলমে তৈরি করে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিলেন যে মানুষটা, তাঁর নাম নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন। সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতা আর অভিমতকে আমাদের ধার করতেই হয়। পত্রিকার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য, “ব্যাপারটা এমন নয় যে সংগঠনের পত্রিকা হয়ে উঠবে শুধুমাত্র এক বিশেষ গোষ্ঠীকে আলোকিত করে তোলার মাধ্যম। ব্যাপারটা এমনও নয় যে পত্রিকা হয়ে উঠবে বিশেষ কোনও মানুষের বা মানুষদের এমন জ্ঞান বিতরণের মাধ্যম, যে জ্ঞানের সাথে সর্বহারার স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। সংগঠনের পত্রিকাকে হয়ে উঠতে হবে তার সদস্য বা অনুরাগীদের কাছের জিনিস, তাদের মনের কথাই লেখা থাকবে সেখানে। পত্রিকার লেখককে সাঙ্ঘাতিক সাহিত্যিক হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বরং লেখককে হয়ে উঠতে হবে এমন একজন, যিনি সহজেই সর্বহারাকে আলোকিত করতে পারেন। লেখককে হয়ে উঠতে হবে ভ্রষ্ট প্রচারের বন্যার সামনে সর্বহারাকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার বাঁধ স্বরূপ। কোনো পেশাদার লেখকের পক্ষে এ কাজ সম্ভব না, তাই তাঁদের প্রয়োজনও নেই এই ধরনের পত্রিকার। এ কাজ করতে পারেন একমাত্র সংগঠনের কাজে নিবেদিত-প্রাণ সচেতন সংগঠকেরাই। লেখাগুলিকে হয়ে উঠতে হবে এক লড়াকু সংগঠনের সুনির্দিষ্ট, ঐক্যবদ্ধ, সুচিন্তিত সাংগঠনিক কাজের সর্ব অর্থে যোগ্য সহায়ক। একক বা ব্যক্তিগত মতামত দেওয়ার কোনো সুযোগ এখানে নেই”।

জন্মলগ্ন থেকে ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’ পরিচালিত হচ্ছে ঠিক এই নীতির ওপর দাঁড়িয়েই। পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা, শাসক শ্রেণীর ক্রমাগত আক্রমণ তাকে এই নীতির ওপর দাঁড় করিয়েছে। প্রতিটা ক্রান্তিকালীন মুহূর্তে, সংগঠনের দৈনন্দিন কাজের প্রতিটা বাঁকে সৈনিকদের রসদ যুগিয়ে এসেছে ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’। পত্রিকার কাজে স্বেচ্ছা-নিবেদিত লেখকেরা সদা সর্বদা চেষ্টা করে গেছেন তাঁদের সবটুকু দিয়ে একে এক ‘সফল’ সাংগঠনিক পত্রিকায় পরিণত করতে। শুধু পত্রিকা প্রকাশ করেই এর পরিচালকমণ্ডলী থেমে গিয়েছে তা নয়—রাজ্যের প্রতিটা প্রত্যন্ত এলাকাতেও যাতে সে পত্রিকা পৌঁছায়, কর্মীরা যাতে পত্রিকা গ্রাহকের হাতে সময় মতো পৌঁছে দেয়, সে দিকেও সতর্ক নজর রেখেছে পত্রিকা পরিচালকমণ্ডলী। এ পত্রিকা অনেকাংশে সফল অবশ্যই, নতুবা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আজও স্বমহিমায় বিরাজ করতে পারতো না।

তবু আজ ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ইন্টারনেটের যুগের প্রচার মাধ্যম, সোস্যাল মাধ্যম যে দ্রুততায় মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, তার মোকাবিলা করা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। যে চতুরতায় এবং পেশাদারিত্ব নিয়ে কর্পোরেটের পোষ্য সংবাদ মাধ্যম মানুষের কাছে তার পসরা পৌঁছে দিচ্ছে, তার স্বরূপ দ্রুততার সাথে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াই শুধু নয়, তার প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয় অবিশ্বাস গড়ে তোলা অবশ্যই এক কঠিন চ্যালেঞ্জ আজকের দিনে। এ চ্যালেঞ্জ পত্রিকা পরিচালকমণ্ডলী গ্রহণ করছে। কিন্তু এ কাজে সংগঠনের সদস্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে। পত্রিকার গ্রাহক হয়ে একে শুধু বাঁচিয়ে রাখলেই চলবে না, নিয়মিত পাঠ করে একদিক দিয়ে যেমন এর কথাগুলি ধারণ করতে হবে, তেমনই এর কোনো খামতি থাকলে সেগুলিকেও নজরে আনতে হবে পত্রিকা পরিচালকমণ্ডলীর আর এ ভাবেই ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’ পৌঁছে যাবে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। পত্রিকা পরিচালকমণ্ডলী মনে করে ‘লেখকের কাজ লেখা আর পাঠকের কাজ পড়া’—এ ধরনের দিন আজ অতীত। লেখক-পাঠকের যৌথ উদ্যোগই আজ পারে পত্রিকাকে তার উদ্দেশ্যেকে সফল করে তুলতে, সংগঠনকে শত্রুর সামনে নিশ্ছিদ্র করে তুলতে। সে নিশ্ছিদ্রতা খুব খুব জরুরী আজকের দিনে। প্রিয় পাঠক, আপনিই পারেন ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’কে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ‘সংগ্রামী হাতিয়ার’ আপনার প্রত্যাশী। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

কেরালায় এল ডি এফ-র ঐতিহাসিক জয়

কংগেস (ধর্মনিরপেক্ষ) ১টি, কেরালা কংগ্রেস (বি) ১টি, কেরালা কংগ্রেস (জ্যাকব) ১টি, জে কেরালা কংগ্রেস ১টি, লোকতান্ত্রিক জনতা দল ১টি আসন পেয়েছে। অন্যদিকে ইউ ডি এফ-র কংগ্রেস ২১টি এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অব মুসলিম লীগ ১৫টি আসন পেয়েছে।

কান্নুর জেলার ধর্মাদম কেন্দ্র থেকে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন পিনারাই বিজয়ন। তিনি কংগ্রেসের সি. রঘুনাথনকে ৫০,১২৩ ভোটে পরাজিত করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা কান্নুর জেলার মাট্টানুর কেন্দ্র থেকে সর্বাধিক ভোটে জয়ী হয়েছেন। তিনি আর এস পি প্রার্থীকে ৬০,৯৬৩ ভোটে পরাজিত করেছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে তিরুবনন্তপুরম জেলার নেমোন কেন্দ্র জিতেছিল বি জে পি প্রার্থী। এবারে ওই কেন্দ্রে সিপিআই(এম) প্রার্থী ভি শিবাকুট্টি বি জে পি বিধায়ক কে রাজাশেখরনকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন। তিরুবনন্তপুরম জেলায় ১৪টি আসনের মধ্যে ১৩টি আসনই জিতেছে এল ডি এফ। পাঠানামুথিট্টা জেলায় সবরীমালা মন্দির অবস্থিত। এই জেলার সবক’টি আসনেই জয়লাভ করেছে এল ডি এফ। এল ডি এফ-র জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে ১০ জন মহিলা। গতবার এই সংখ্যা ছিল ৮।

এবারের নির্বাচনে এল ডি এফ-র ৯৯টি আসন পাওয়াটাও একটা সর্বকালীন রেকর্ড। এর আগে এল ডি এফ সর্বাধিক আসন পেয়েছিল ২০06 সালের বিধানসভা নির্বাচনে, ৯৮টি। এরপরের বিধানসভা নির্বাচন ২০১১ সালে এল ডি এফ জয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। পেয়েছিল ৬৮টি আসন। আর মাত্র ৩টি আসন পেলে সেবারই ইতিহাস রচনা করতে পারত এল ডি এফ। ওই বিদায়ী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভি এস অচ্যুতানন্দন।

প্রসঙ্গত, ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর কেরালা রাজ্য গঠন হবার প্রথম বিধানসভা নির্বাচন হয় ১৯৫৭ সালে। ২০২১ সালের নির্বাচন পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচন। ১৯৫৭ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সরকার গড়েছিল। ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে এই সরকার শপথ নেয় ১৯৫৭ সালের ৫ এপ্রিল। কিন্তু সেই সরকারকে পুরো মেয়াদ চলতে দেয়নি তৎকালীন কেন্দ্রের জওহরলাল নেহরু সরকার। ১৯৫৯ সালের ৩১ জুলাই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এই সরকারকে ফেলে দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সালের কেরালায় কমিউনিস্টদের সরকারই ছিল দুনিয়ায় প্রথম নির্বাচনের মাধ্যমে জিতে তৈরি করা কমিউনিস্টদের সরকার। কেরালায় মোট ৮ বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে। এবারে যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হতে চলেছে সেটি হবে কেরালার ২৩তম মন্ত্রিসভা। □

দেবাশীষ রায়

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

পুনরায় নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস

স্বাধীনতার পরে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। এমনকি স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় বামপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। সংযুক্ত মোর্চার অপর শরিক নবগঠিত ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট একটি মাত্র আসনে জয়ী হয়েছে। শতাংশের বিচারেও সংযুক্ত মোর্চার ভোট প্রাপ্তি দুই অঙ্কের সংখ্যায় পৌঁছোতে পারেনি। এক কথায় বিপর্যয় ঘটেছে এই জোটের।

সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে তা হল, রাজ্যের শাসক দলের অজস্র প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও, নির্বাচকমণ্ডলীর একাংশ এই ক্ষোভের থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপদকে। ফলে অ্যান্টি-ইনকামরেন্সী যে মাত্রায় শাসকদলের বিরুদ্ধে কাজ করার কথা তা করেনি। বিপরীতে কেন্দ্রের শাসকদলের জনবিরোধী পদক্ষেপও এ রাজ্যে তাদের বিরুদ্ধে গেছে। নির্বাচন-উত্তর পর্বে সব থেকে বড় প্রশ্ন—বিধানসভার অভ্যন্তরে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী সহ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলবে কে? □

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

কোভিড পরিস্থিতি—বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য

প্রস্তুতি না নেন তাহলে আমরা আরো কত মৃত্যুমিছিল দেখবো তার ঠিক নেই।

করোনা আবহের মধ্যেই আরো একটি মারণ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে—‘ব্ল্যাক ফাঙ্গাস’ বা ‘মিউকরমাইকোসিস’। করোনা উপসর্গের সঙ্গেই ব্ল্যাক ফাঙ্গালে আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে। গত ১৯ মে ’২১ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সব রাজ্যকে নির্দেশিকায় জানায়, মহামারির তালিকায় আনা দরকার ছত্রাকজনিত সংক্রমণ মিউকরমাইকোসিসকেও। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা জারির আগেই রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, দিল্লীর মতো রাজ্য মিউকরমাইকোসিসকে মহামারী বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয়।

সংক্রমণের লক্ষণ ঃ চিকিৎসকদের মতে নাকের ভিতর, সাইনাস, চোখ এবং মস্তিষ্কে এই সংক্রমণ দেখা যায়। মস্তিষ্কে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে মোকাবিলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কপাল, নাক, চোয়াল, দুই চোখের মাঝখানে এবং দাঁতের পিছনের পায়ুথলির আবরণে এই সংক্রমণ দেখা দেয়। চোখ, ফুসফুস ও মস্তিষ্কে সংক্রমণ ছড়ায়। নাকের ওপর কালো দাগ, দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া, বুকে ব্যথা এবং কাশির সাথে রক্ত বের হওয়াই মূলত লক্ষণ।

এখন থেকেই সবাই যদি সচেতন না হয় এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থায় উদ্যোগী না হয় তাহলে আগামীতে এই রোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে বহু মানুষকে আক্রান্ত করবে ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। যেহেতু বেশিরভাগ করোনা উত্তীর্ণদেরই এই রোগ হচ্ছে তাই আগামী সতর্কতা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া জরুরী। □

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

মার্চ-এপ্রিল মাস ব্যাপী পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। এই রাজ্যগুলি হ'ল পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম এবং দক্ষিণ ভারতের তিনটি রাজ্য কেরালা, তামিলনাড়ু এবং পুডুচেরি। পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার মোট আসন ছিল ৮২৪টি। ২রা মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলে একাধিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে যা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যে পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল সেসব রাজ্যে কোনও একটি দল বা জোট সবগুলি রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিল না। বিপ্রতীপে বিভিন্ন দল বা জোট ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিল। যেমন পশ্চিমবাংলায় বিগত দশ বছর ধরে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। আসামে বিজেপি-আসাম গণ পরিষদ নেতৃত্বাধীন জোট। কেরালায় সি.পি.আই(এম) নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, তামিলনাড়ুতে এ. আই. এ. ডি. এম. কে নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, আসামে বিজেপি-অগপ জোট দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতাসীন হয়। অবশ্য বিজেপির আসন সংখ্যা অপরিবর্তিতই থাকে। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ২৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯ হয়েছে। অন্যদিকে এ.জি.পি'র আসন সংখ্যা ১৪ থেকে হ্রাস পেয়ে ৯ হয়েছে। তাদের ভোটের হারও হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমবাংলায় তৃতীয়বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়েছে। পূর্বের তুলনায় তাদের আসন সংখ্যা এবং ভোটের হার উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজেপি'র আসন সংখ্যা গত বিধানসভা নির্বাচনে ছিল মাত্র তিন। এবারের নির্বাচনে তারা ৭৭টি আসনে জয়ী হয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে। অবশ্য ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৮টি আসন লাভ করেছিল এবং এর ভিত্তিতে ১২৬টি আসনে এগিয়ে ছিল। এই অর্থে অর্থাৎ লোকসভার তুলনায় বিধানসভায় বিজেপি'র ফলাফল খারাপই হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধী বামপন্থী-কংগ্রেস-ইণ্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট নিয়ে গঠিত সংযুক্ত মোর্চা মাত্র একটি আসন লাভ করেছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বামপন্থী ও কংগ্রেস দলের কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই। অর্থাৎ বাম-কংগ্রেস শূন্য বিধানসভা এই প্রথম গঠিত হয়েছে। তামিলনাড়ুতে বিপুল শক্তি নিয়ে দ্রাবিড় মুন্নাত্রা কাজাগাম (ডি.এম.কে) ২৩৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৩টি কেন্দ্রে জয়ী হয়ে দশ বছর পর রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। প্রধান বিরোধী দল এ.আই.এ.ডি.এম.কে ১৩৫ থেকে হ্রাস পেয়ে ৬৬ হয়েছে। বিজেপি পেয়েছে মাত্র চারটি আসন। সব থেকে চমকপ্রদ ফলাফল দেখা গেছে কেরালায়। এখানে ক্ষমতাসীন সি.পি.আই(এম) নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (এল.ডি.এফ) আসন সংখ্যা ৯১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯ হয়েছে। প্রধান শরিক সি.পি.আই(এম)-এর আসন সংখ্যা ৫৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬২ হয়েছে। কেরালায় বিগত চার

দশকের মধ্যে কোনও দল বা জোট পরপর দু'বার নির্বাচনে জয়ী হয়নি। এবার এল.ডি.এফ এই প্রথা ভেঙে পরপর দু'বার নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করেছে।

(এক)

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করার পূর্বে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রে বিজেপি ২০১৪ ও ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। বিজেপি'র এই জয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। আর ছিল তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রলোভন, বেকারদের কর্মসংস্থান, প্রতিটি পরিবারের এ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া, সরকারী দপ্তরে শূন্যপদে নিয়োগ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ প্রভৃতির ন্যায় গালভরা প্রতিশ্রুতিগুলি যেমন ছিল তেমনই সি.এ.এ., এন.পি.আর., এন.আর.সি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিতাড়নের আয়োজনও বিজেপি'র পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। বিগত সাত বছরে বিজেপি'র রাজত্বে নোটবন্দী, অপরিকল্পিতভাবে জি.এস.টি. চালু, লাভজনক ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রধান ভিত্তিকে দুর্বল করে দেওয়া, রেল, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি সরকারী পরিষেবার বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া তাদের অপকর্মের তালিকায় নতুন এক সংযোজন। কৃষিক্ষেত্রে তিনটি বিল, শ্রমক্ষেত্রে চারটি শ্রমকোড-এর মাধ্যমে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কৃষিবিল বাতিলের দাবিতে কৃষক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তা ছয়মাস অতিক্রান্ত। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা'র পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের সমর্থনে পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচকমন্ডলীর কাছে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। বিজেপি'র শাসনে দেশের সংবিধানের অন্যতম স্তম্ভ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যগুলির মতামত ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে নয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি। এছাড়াও রাজ্যগুলির ক্ষমতা সঙ্কুচিত করতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজ্যগুলির ন্যায়সঙ্গত পাওনা বিভিন্ন অজুহাতে আটকে রাখা হচ্ছে। কোভিড সংক্রমণের দুটি পর্যায়েই একে মোকাবিলা করতে কেন্দ্রীয় সরকার নাজেহাল হয়েছে। করোনার পরীক্ষা, তাদের আলাদা করে রাখা, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন ব্যর্থতা করোনার প্রথম পর্বে পরিলক্ষিত হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় পর্বে টীকাকরণ, ঔষধ সরবরাহ, হাসপাতাল সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা প্রভৃতি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ব্যাপক ব্যর্থতা। বস্তুতপক্ষে মৃত বা আক্রান্তের মাপকাঠিতে ভারত প্রথমদিকে অবস্থান করছে।

সদ্য সমাপ্ত পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে যেমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনই এর ফলাফলের পিছনে সর্বভারতীয় কার্যকারণ সহ কিছু রাজ্যস্তরের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলি পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

(দুই)

প্রথমে আসামের নির্বাচনী পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এই রাজ্যের বিজেপি তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছে। একটি সর্বভারতীয় পাক্ষিকে রাজ্যের নির্বাচনী পর্যালোচনার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে (ভিক্টরি ফর ডিভাইডিং পলিটিক্স বা 'বিভাজনের রাজনীতির জয়')। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এর পূর্বে ৬০টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এবারে তার প্রাপ্ত ভোটের হার (৩৩ শতাংশ) পূর্বের থেকে কিছুটা বৃদ্ধি (২৯.৫১ শতাংশ) পেলেও আসন সংখ্যা (৬০) অপরিবর্তিতই থাকে। আসামে বিজেপি-অগপ জোটের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল কংগ্রেস-এ.আই.ইউ.ডি.এফ জোট। এছাড়া এবারের নির্বাচনে তৃতীয় শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে দুটি আঞ্চলিক দল আসাম জাতীয় পরিষদ (এ.জে.পি.) এবং রায়জোড় দল। আসামে সি.এ.এ. (সিটিজেন্স এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট) বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উভয় দলের আত্মপ্রকাশ। এরা এবারের নির্বাচনে মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করে।

রায়জোড় দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং কৃষকনেতা বলে পরিচিত অখিল গোগৈ আসামের রাজনীতিতে একমাত্র নেতা যিনি জেলবন্দী থাকাকালীন জয়ী হয়েছেন। সি.এ.এ. বিরোধী অপর দল এ.জে.পি-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সি.এ.এ. বিরোধী সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ লুরিনজ্যোতি গোগৈ যে দুটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, উভয় আসনেই পরাজিত হয়েছে। এ.জে.পি এবং রায়জোড় দল-এর মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হলেও শেষ পর্যন্ত তারা ২৫টি আসনে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

বিজেপি একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সরকার পরিচালনা করতে তাকে আঞ্চলিক দল ইউ.পি.পি.এল (ইউনাইটেড পিপল্স পার্টি লিবারাল)-এর উপর নির্ভর করতে হবে। এই দল ছয়টি আসনে জয়ী হয়েছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি তার শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত চা-বাগান এলাকায় তাদের প্রভাব বজায় রাখতে পেরেছে। অবশ্য কংগ্রেস এই ঘাঁটি দখল করতে প্রাক্ নির্বাচনী পর্বে চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তা বিশেষ কার্যকর হয়নি। কারণ কংগ্রেস নির্বাচনী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বেই বিজেপি সরকার দৈনিক মজুরি বর্তমান ১৬৭ টাকা থেকে ৫০ টাকা বৃদ্ধি করে। অবশ্য নতুন বিজেপি সরকারকে এর জন্য আর্থিক বোঝা বহন করতে হবে।

বিজেপি বরাক উপত্যকার বাঙালি অধ্যুষিত ১৫টি আসনের মধ্যে ছয়টি আসনে জয়লাভ করেছে। ২০১৬ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ২টি কম। বিরোধী জোট ৯টি আসনে জয়ী হয়েছে, যার মধ্যে কংগ্রেসের পাওয়া আসনের সংখ্যা ৫টি। এ.আই.ইউ.ডি.এফ. (অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট) রাজ্যে তিনটি পার্বত্য জেলা যেমন কার্বি আলঙ, পশ্চিম কার্বি আলঙ এবং ডিমা হাসাও'র পাঁচটি আসনের সবকটিতেই বিজেপি জয়ী হয়েছে।

আসামের রাজনৈতিক মহল এবং নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের মতে ডিমাপুরে ধর্মীয় লাইনে ভোটের মেরুকরণ বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে সাহায্য করেছে। বিজেপির প্রচারের মূল অভিমুখ ছিল এই যে কংগ্রেস এবং তার সহযোগী এ.আই.ইউ.ডি.এফ প্রধানত অসমীয়া এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির স্বার্থবিরোধী। বিজেপি এই দুই রাজনৈতিক দলকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থবাহী বলে চিহ্নিত করেছে। এমনকি নির্বাচনের পূর্বে তারা প্রচার চালিয়েছিল যে কংগ্রেসের সমর্থনে এ.আই.ইউ.ডি.এফ নেতা বদরুদ্দিন আজমল আসামের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এ.জে.পি এবং রায়জোড় দলের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়েছিল যে বিজেপি'র ন্যায় এ.আই.ইউ.ডি.এফ-ও একটি সাম্প্রদায়িক দল। এই প্রচার পরোক্ষভাবে বিজেপিকে সাহায্যই করেছিল।

আসামে বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলেও আগামী দিনে দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। প্রথমত জোট শরিক অগপ-র সাথে তার সম্পর্ক যা ইতোমধ্যেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এবারের নির্বাচনে বেহরমপুর কেন্দ্রে বিজেপি'র দাবী অনুযায়ী অগপকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি। এই কেন্দ্রটি থেকে অগপ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মোহান্তি সাতবারের বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু বিজেপি'র চাপে অগপ আসনটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ক্ষোভ ও অভিমানে প্রফুল্ল মোহান্তি অন্য কোনও আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। দ্বিতীয়ত বিজেপি'র আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। সর্বানন্দ সোনোয়ালকে সরিয়ে এবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। বিশ্ব শর্মা বর্তমানে বিজেপি'র উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান। ইতোমধ্যেই সর্বানন্দর অনুগামী ঐ পদ থেকে হিমন্ত'র অপসারণ দাবী করেছে। ফলে একদিকে বিজেপি'র আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং অন্যদিকে শরিক অগপ'র সাথে বিরোধ আগামী দিনে জোট

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সপ্তম পৃষ্ঠার পরে

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

সরকারের চলার পথে সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

(তিন)

পাঁচটি রাজ্যের সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল তামিলনাড়ু। এর অন্যতম কারণ ছিল তামিল রাজনীতির প্রধান দুই শক্তি কুমারী জয়ললিতা এবং এম. জি. রামচন্দ্রনের অনুপস্থিতিতে এবারের তামিলনাড়ুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও দুটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। একটি জোটের নেতৃত্বে ছিল ডি.এম.কে নেতা প্রয়াত এম. করুণানিধির পুত্র এম. স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন জোট। এখানে রয়েছে ডি.এম.কে, এম.ডি.এম.কে, কংগ্রেস, ভি.সি.কে, সি.পি.আই(এম), সি.পি.আই ও কিছু ছোট দল। অপর জোটের নেতৃত্বে ছিল এ.আই.এ.ডি.এম.কে, বি.জে.পি, পি.এম.কে ও কয়েকটি ছোট দল।

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে ২৩৪টি আসন বিশিষ্ট তামিলনাড়ু বিধানসভায় ডি.এম.কে জোট ১৫৯টি আসনে জয়ী হয়েছে। এর মধ্যে ডি.এম.কে পেয়েছে ১৩৩টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে ১৮টি আসন। সি.পি.আই(এম) ও সি.পি.আই পেয়েছে দুইটি করে আসন এবং ভি.সি.কে পেয়েছে চারটি আসন। অন্যদিকে এ.আই.এ.ডি.এম.কে পেয়েছে ৬৬টি আসন, বিজেপি ৪টি আসন, পি.এম.কে পেয়েছে পাঁচটি আসন অর্থাৎ মোট ৭৫টি আসন। বিদায়ী বিধানসভায় ডি.এম.কে এবং এ. আই. এ. ডি. এম. কে'র আসন সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৮টি এবং ১৩৫টি আসন। এবারের নির্বাচনে ডি.এম.কে ১৩৩টি আসনে জয়লাভ করে দশ বছর পরে তামিলনাড়ুর শাসনক্ষমতায় আসীন হয়েছে। দশ বছরের শাসক দল এ.আই.এ.ডি.এম.কে এবং তার জোট শরিক বিজেপি'র শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বিজেপি পেয়েছে মাত্র চারটি আসন। রাজ্যের কন্যাকুমারী লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে ডি.এম.কে প্রার্থী বিজেপিকে লক্ষাধিক ভোটে পরাজিত করেছে। সি.পি.আই(এম) এবং সি.পি.আই ছয়টি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুইটি করে আসনে জয়ী হয়েছে।

কংগ্রেস এবং ভি.সি.কে'র নির্বাচনী সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয় দলই দলিতদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ডি.এম.কে'র সহযোগী হয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যথাক্রমে ১৮টি ও ৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে এ.আই.এ.ডি.এম.কে'র সাফল্য আশাপ্রদ হলেও, অন্যান্য জেলাগুলিতে তা হতাশাজনক। দলের প্রধান নেতাদের অধিকাংশই জয়ী হলেও দশজন প্রাক্তন মন্ত্রীর পরাজয় দলের ক্ষেত্রে বড় আঘাত।

আসামের ন্যায় তামিলনাড়ুতেও এ. আই. এ. ডি. এম. কে-বিজেপি জোট খুব মসৃণ ছিল না। বস্তুতপক্ষে এ. আই. এ. ডি. এম. কে নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী নির্বাচনে বিজেপি'র সাথে জোট গঠনে আগ্রহী ছিলেন না। উভয় দলের নির্বাচনী প্রচারসভাও খুব ব্যাপকভাবে হয়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে বিজেপি-আর.এস.এস-এর সাম্প্রদায়িক প্রচারের সাথে গলা মেলাতে এ. আই. এ. ডি. এম. কে-র অনেকেই চায়নি। তামিলনাড়ুর রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার যে অভিলাষ বিজেপি'র ছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। অন্তত নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের তাই অনুমান।

(চার)

এবারে অনুষ্ঠিত পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে অন্যতম রাজ্য ছিল কেরালা। কেরালায় বিগত চার দশকে কোনও একটি দল বা জোট পরপর দুটি নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়নি। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সি.পি.আই(এম) নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এল.ডি.এফ) সরকার গঠন করেছিল। এবারে সকলের দৃষ্টি ছিল দ্বিতীয়বারের জন্য জয়ী হয়ে এল.ডি.এফ সরকার গঠন করে এই রেকর্ড ভেঙে নতুন ঐতিহ্য স্থাপন করে কিনা? এছাড়া বিগত ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে শবরিমালা মন্দিরে সব বয়সী নারীদের প্রবেশাধিকারকে কেন্দ্র করে এল.ডি.এফ-এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালিয়ে কংগ্রেস পরিচালিত ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউ. ডি. এফ) রাজ্যের ২০টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৯টিতে জয়ী হয়। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পায় মাত্র একটি আসন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ইউ.ডি.এফ এই সাফল্য ধরে রাখতে পারে কিনা, বা বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ঘুরে দাঁড়াতে পারে—তাও রাজনৈতিক মহলের পর্যালোচনার বিষয় ছিল।

বিগত পাঁচ বছরে কেরালার উপর দিয়ে একাধিক প্রাকৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দুর্যোগ অতিবাহিত হয়েছে। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দু-দুটি বিধ্বংসী বন্যার মুখোমুখি হয়েছে কেরালা। নিপা ফ্লু-র সংক্রমণে রাজ্যের এক বড় অংশ আক্রান্ত হয়েছে। ২০১৭ সালের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রাজ্যটি প্রবলভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এই সমস্ত বিপর্যয়ে রাজ্য প্রশাসন, বিরোধী দল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে প্লাবন পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী আকাশপথে পরিদর্শন ও সামান্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। বন্যাবিধ্বস্ত ১৪টি জেলার জন্য মাত্র এক হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য মিলেছিল। কেরালার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষকে নিয়ে উদ্ধার, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বন্টনের যে কর্মসূচী বিজয়ন সরকার গ্রহণ করেছে, তা জনগণ দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। ভোটের ফলাফলই তার প্রমাণ।

নিপা ফ্লু-র সংক্রমণ প্রতিরোধে এল.ডি.এফ সরকারের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। একইভাবে করোনার অতিমারির আক্রমণ থেকে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে. কে. শৈলজার নেতৃত্বে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও জনগণের যৌথ প্রয়াস কেরালাবাসীকে যেভাবে রক্ষা করেছে তা শুধু জাতীয় স্তরেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কেরালার সামগ্রিক নির্মাণ কাণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু কোথাও তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবাংলার মতন চাল চুরি, ত্রিপল চুরি, টাকা চুরির অভিযোগ কেরালায় ওঠে না। রাজ্যে কর্মরত দেশান্তরী শ্রমিকদের প্রতি চরম মানবতার নিদর্শন রেখেছেন কেরালার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন অন্য রাজ্য থেকে বাড়ী ফিরে আসা শ্রমিকদের 'করোনা এক্সপ্রেসের যাত্রী' বলে বিদ্রুপ করেন তখন কেরালায় এরা অতিথি শ্রমিক বলে পরিগণিত হল। এই ধরণের চার লক্ষ শ্রমিক যারা নিজ রাজ্যে ফিরতে ইচ্ছুক সরকারী ব্যবস্থাপনায় তাদের বাড়ীতে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছেন।

কেরালার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকারের আমলে উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি হল (১) কেরালায় এক সময়ে লোকসানে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি লাভজনক হয়ে উঠেছে, বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউনিটগুলি নতুন করে চালু করা সম্ভব হয়েছে। এক তথ্যে দেখা গেছে যে এইসব সংস্থা রাজ্যের কোষাগারে ১২ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় কোষাগারে ৮৮১ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। (২) রাজ্যের অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের অধীনে রয়েছে ১৫৮৯টি মাভেলি সুপার মার্কেট এবং ৯৫টি সরকারি বামারি মেডিক্যাল স্টোর্স। এখান থেকে মুদিখানার দ্রব্যসামগ্রী ও ঔষধপত্র ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়া প্রায় এক কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করা হয়। (৩) কেরালাই দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে কৃষকদের রয়ালিটি দেওয়া হয়। রাজ্যের প্রায় পাঁচ হাজার একর শুখা জমিকে চাষের জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা এই সময়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে এন.আর.ই.জি.-তে কেরালার অংশ ছিল ২৫৮ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ সালে তা কমিয়ে করা হয় মাত্র ৭১ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে কেরালার অংশ ছিল ০.৯১ শতাংশ, ২০২১ সালে তা কমে হয়েছে ০.৬১ শতাংশ। ২০১১-১৪ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কর্মসূচী বাবদ কেরালার প্রাপ্তির পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার বেশি। এন.ডি.এ আমলে তা ৩৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। ২০১৯ সালে বন্যার সময় কেরালা সহায়তা বাবদ ১২০৯ কোটি টাকা চেয়েছিল, কিন্তু পেয়েছিল মাত্র ৫২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিপুল রাজনৈতিক বৈষম্য সত্ত্বেও কেরালার বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের জনমুখী ও বিকল্প কর্মসূচীর ফলে এই সরকারের প্রতি জনসমর্থন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে তা নির্বাচনী ফলাফলই প্রমাণ করছে।

এবারের নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ৯৯টি আসনে জয়ী হয়েছে। ফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক সি.পি.আই(এম) পেয়েছে ৬২টি আসন। ২০১৬ সালে এল.ডি.এফের আসন সংখ্যা ছিল ৯১টি। সি.পি.আই(এম)-এর আসন সংখ্যা ছিল ৫৮টি আসন। অন্যদিকে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ.ডি.এফ পেয়েছে ৪১টি আসন, ২০১৬ সালে ইউ.ডি.এফের আসন সংখ্যা ছিল ৪৭টি আসন। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ২৭ থেকে ২১ হয়েছে। বিজেপি গত বিধানসভা নির্বাচনে একটি আসনে জয়ী হয়েছিল, এবারে তাদের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা শূন্য।

এবারের কেরালা নির্বাচনে তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে মেরুকরণের রাজনীতি করেছিল বিজেপি। কিন্তু কেরালার জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

(পাঁচ)

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম রাজ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৮টি কেন্দ্রে বিজেপি জয়ী হয়েছিল। ১২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়েছিল। প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ৪০ শতাংশ। এই নির্বাচনী 'সাফল্যে' বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়াকে নিশ্চিত ধরে নিয়েছিল। বিজেপি নেতা অমিত শাহ এবং বিজেপি সভাপতি উভয়েই বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে ২০০টি আসন নিশ্চিতভাবে পাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে ২০টি এবং অমিত শাহ ৪৫টি জনসভা করেছেন। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন স্তরের বিজেপি নেতারা সভা করেছেন। এই লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছিল বিজেপি। এই প্রচারের মোকাবিলা করতে তৃণমূল কংগ্রেসও সাম্প্রদায়িক প্রচারকে অনেক অঞ্চলে ইস্যু করেছিল।

নির্বাচনের পূর্বে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস এবং ইণ্ডিয়ান সিকিউলার ফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংযুক্ত মোর্চা গড়ে তুলেছিল। এবং রাজ্যের সবকটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কিন্তু এই মোর্চা মাত্র একটি আসনে জয়ী হয়। তৃণমূল কংগ্রেস ২১৩টি আসনে জয়ী হয়। বিজেপি পায় ৭৭টি আসন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থী এবং কংগ্রেস দল কোনও আসন পায়নি। অবিভক্ত বাংলায় তৎকালীন আইনসভায় কমিউনিষ্ট পার্টির তিনজন সদস্য ছিলেন। এঁরা হলেন কমরেড জ্যোতি বসু, কমরেড রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং কমরেড রূপনারায়ণ রায়। তারপর থেকে প্রতিটি নির্বাচনেই বিধানসভায় বামপন্থীদের প্রতিনিধি ছিল। এমনকি ১৯৭২ সালের জাল জুয়াচুরির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বামপন্থী শূন্য বিধানসভা তৈরী করা সম্ভব হয়নি। সেদিক থেকে এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অবশ্যই গভীরভাবে আলোচনার বিষয়।

এটা ঠিক যে নির্বাচনী প্রচারে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ষড়যন্ত্র ছিল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতা যে এই মেরুকরণের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন একথা ভাবা ভুল। বিপরীত পক্ষে দলীয় মেরুকরণের ঘটনাই ছিল প্রবল। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয় দলের মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণই ঘটেছে। আর এই উভয় দলের বাইনারির মধ্যে একটিকে পছন্দ করে নেওয়ার জন্য অধিকাংশ প্রচারমাধ্যম প্রচার চালিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি মিলিতভাবে ৮৬ শতাংশের বেশি ভোট পাওয়ার ঘটনা এটাই প্রমাণ করে।

এবারের এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে চরম প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী দুটি দলের ৮৬ শতাংশ ভোট পাওয়া এবং সি.পি.আই(এম) ও কংগ্রেস পেয়েছে যথাক্রমে ৪.৭৩ শতাংশ ও ২.৯৩ শতাংশ ভোট। আসলে এর পিছনে অন্যতম কারণ হ'ল মানুষের চেতনার ঘাটতি ব্যাপকভাবে কমে গেছে। রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের পক্ষ থেকে তীব্র বামপন্থী বিরোধী প্রচার চালানো হয়েছে বিশেষত বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে। এই প্রচার এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করছে যেখানে বামপন্থী মতাদর্শ প্রচারের সামনে বড় বাধা। সুতরাং বামপন্থী মতাদর্শ প্রচারের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য লড়াই করতে হবে। এর জন্য সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। মানুষের পাশে তাদের দাবীদাওয়া, সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একইসাথে নির্বাচনী ফলাফলের গভীর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শুধু সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনই নয়, ২০১১ সালের পর থেকে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে তার ফলাফল গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে ধীর স্থিরভাবে এই অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের প্রতি দৃঢ় আস্থা এবং সংগঠন আন্দোলন গড়ে তোলার অকৃত্রিম প্রতিজ্ঞা। তবেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আমরা নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হতে পারব। □

অনিয়মিত বদলী ঃ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের একই দৃষ্টিভঙ্গী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের অবসরের পর পুনর্বহালের সময়কালে বদলি করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার 'স্বৈরাচারী' বদলি নীতির হরেক দৃষ্টান্ত রেখেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বাম কর্মী-নেতারা। তাঁদের মতে, সেরকম ভাবেই কেন্দ্রের এই বদলির সিদ্ধান্ত। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেন, বদলির ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতির ধার ধারেনি তৃণমূল সরকার। ২০১১-র পর থেকে বহু কর্মী-অফিসারকে জোর করে বদলি বা অপেক্ষা তালিকায় পাঠানো হয়েছে। ২০১৮-র ২৯ নভেম্বর বেতন কমিশনের রিপোর্ট দাখিল এবং মহার্ঘভাতার দাবিতে বিরতির সময় বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দ। ক'দিন বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী আমাদের সংগঠনের ১৫ জন নেতাকে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে বদলি করে দেওয়া হয়।

বিজয়বাবু বলেন, 'মহাকরণে বাম আমলে তৃণমূল কর্মীরা কাজের সময় বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কুশপুতুল পুড়িয়েছিলেন। তাতেও বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আর, আমাদের বিরতির সময়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখানো সত্ত্বেও রাতারাতি বদলি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কী মাত্রাছাড়া প্রতিহিংসা। আমাকে যেখানে বদলি করেছে, শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ি পথে চার ঘণ্টা লাগে। ঘুম থেকে দেড় ঘণ্টা দূরে বিজনবাড়িতে। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষকে বদলি করা হয়েছে কালিম্পংয়ে। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীকে বদলি করা হয়েছে ম্যালে।

এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'নবান্নে কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি উত্থাপন করায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক সহ ১৫ জন নেতৃত্বকে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় হয়রানিমূলক বদলী করা হয়। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়নি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি স্বীকৃত সংগঠন পরিচালনা করতে পদাধিকারী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংগঠনের মূল জায়গায় কর্মরত রাখাই রীতি। সেই রীতিকে উপেক্ষা করে নেতৃত্বের বদলী করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দীর্ঘ দু'বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকরী হয় না—এটাই বোধহয় এই সরকারের রীতি।

বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে বাড়িতে থেকে বা বাসস্থানের কাছাকাছি থেকে কাজ করাটাই যখন স্বাস্থ্যসম্মত, তখন অধিকাংশ নেতৃত্বকে হয়রানিমূলক বদলীর শিকার হয়ে কর্মসূত্রে বাসস্থানের দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের দরুন করোনায় আক্রান্ত হতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন নেতৃত্বকে তার বদলী হওয়া কর্মস্থল থেকে অবসর নিতে হয়েছে। এখনও ৯ জন নেতৃত্বকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। শুধু আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বই নয়, সরকারের রোষানলে পরে অনেক বামপন্থী সংগঠনের কর্মী-নেতৃত্বকে হয়রানিমূলক বদলীর শিকার হতে হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী সংবিধান দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বীকৃত ব্যবস্থাপনাকে উপেক্ষার লক্ষণ প্রতীয়মান হচ্ছে। আমরা এই প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করছি। একই সাথে সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রশাসন পরিচালনার দাবি জানাচ্ছি।' □

সৌজন্যে ঃ হিন্দুস্থান সমাচার

গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বরতা

সুমিত ভট্টাচার্য

গাজার ওপর ইসরায়েলের পর্যায়ক্রমিক সামরিক হানার আরও একটি পর্ব আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল গত ২০ মে, টানা ১১ দিন বিরামহীন বোমাবৃষ্টির পর। এই বোমা বর্ষণের সিংহভাগই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহকৃত আধুনিক সমরাস্ত্রে বলীয়ান ইসরায়েলের দিক থেকে। এই ১১ দিনের সংঘর্ষে ইসরায়েলের তুলনায় প্যালেস্টাইনের হতাহতের সংখ্যাও প্রায় বিশ গুণ।

গাজার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ইসরায়েল এর আগে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ২০১৪ সালে। অর্থাৎ ঠিক ৭ বছর আগে। ২০১৪ সালের সংঘর্ষ চলেছিল ৫১ দিন এবং দু'হাজারের বেশি প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছিলেন। যাদের একটা বড় অংশ ছিলেন অসামরিক সাধারণ মানুষ। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের সংঘর্ষে ১৪২টি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল। গাজার ওপর ঐ হামলায় ৫৪৭টি শিশুর জীবনহানি ঘটেছিল।

সাম্প্রতিকতম আক্রমণের মতোই ২০১৪ সালেও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, হাসপাতাল, অসামরিক নাগরিকদের আবাসস্থল এবং উদ্বাস্তু শিবিরগুলি। সাত বছর আগের যুদ্ধে যে সমস্ত বাড়ি, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তাদের অনেকগুলিরই এখনও সম্পূর্ণ সংস্কার হয়নি।

২০০৬ সালে গাজা হামাসের নিয়ন্ত্রণে আসার পর থেকেই এই ভূখণ্ডটি ইসরায়েলের অবরোধের শিকার, যার ফলে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এবং পর্যায়ক্রমে গাজার মানুষ ইসরায়েলের নির্মম হানাদারির শিকার হয়েছেন।

২০০৮-০৯ এবং ২০১২ সালে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক আগ্রাসন কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। ইসরায়েলের এই পর্যায়ক্রমিক নির্মম সামরিক আগ্রাসনের লক্ষ্য একটাই, যাতে হামাস সরকার ঐ ভূখণ্ডটির অধিবাসীদের সুস্থ জীবন ও উন্নত ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করতে না পারে। ২০১৪ সালের আক্রমণে প্যালেস্তিনীয়দের সম্পূর্ণ পরিবার ও তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। এবারেও একই ঘটনা ঘটেছে।

গাজায় একজন সরকারী মুখপাত্রের বক্তব্য হল, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে ঐ ভূখণ্ডে এবার প্রায় ১৫,০০০ আবাসন ধ্বংস করা হয়েছে। ৪টি বড় মসজিদ সহ গাজার শিল্প অঞ্চলের অধিকাংশ কলকারখানাও পুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের ৫০ শতাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ইসরায়েলের আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ, মিসাইল হানা এবং মাটি থেকে গুলি বর্ষণের ফলে ৬৬ জন শিশু সহ মোট ২৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৯০০-রও বেশি অসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন।

বিপরীতে গাজা থেকে মিসাইল প্রত্যুত্তরে ইসরায়েলের মাত্র ১২ জন মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। এই ১২ জনের মধ্যে তিনজন বিদেশী। একজন কেরালাবাসী নার্স, বাকি দু'জন থাইল্যান্ডের। একজন মাত্র ইসরায়েলি সেনার মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুহারের এই তারতম্য থেকে গাজার অসহায় মানুষের ওপর ইসরায়েলের হিংস্র আক্রমণের চরিত্র বোঝা যায়।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা দপ্তর গাজার ওপর নিয়মিত ব্যবধানের এই সামরিক শক্তির প্রদর্শনীকে ইসরায়েলের পশ্চাৎভূমির সংরক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করেছে। নিয়মিত ব্যবধানে এই আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে ইসরায়েল তার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিশিষ্ট অস্ত্রভাণ্ডারের ধ্বংস ক্ষমতাও যাচাই করে নিতে পারে। কারণ ইসরায়েল এখন সামরিক অস্ত্র রপ্তানিকারক বৃহৎ দেশগুলির প্রতিযোগী।

২০১৯ সালে ইসরায়েল ৯০০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র রপ্তানি চুক্তি করে, যা ঐ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। যে সমস্ত অস্ত্রের মারণক্ষমতা পরীক্ষিত হয়েছে আন্তর্জাতিক অস্ত্র বাজারে তার দাম বেশি। গত বছরের আজারবাইজান বনাম আরমেনিয়ার যুদ্ধে ইসরায়েলের তৈরি ড্রোনের প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। আজারবাইজানের জয়ে একটা বড় ভূমিকা ছিল ইসরায়েলে তৈরি ঘাতক ড্রোনের। গাজা সংঘর্ষেও অসামরিক নাগরিক এবং হামাসের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে ঘাতক ড্রোনের যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

ইসরায়েলের সামরিক বিশেষজ্ঞদ্বয় এফ্রেইম ইনবার এবং এইটান শমির ২০১৪ সালে একটি প্রবন্ধে বলেন, পরিষ্কার কথা হল ইসরায়েলের মাঝে মাঝেই ঘাস ছাঁটা দরকার। তাদের প্রবন্ধের মোদ্দা কথা ছিল, হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েল দীর্ঘকালীন লড়াই চালাবে। এই প্রসঙ্গে ইসরায়েলের একজন প্রাক্তন বামপন্থী আইন বিশারদ মন্তব্য করেছেন, 'ইসরায়েল অবিরাম যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে সম্ভবত ভুলে গেছে, মানুষ তাদের ছবির মতো নির্বাক নয়। প্রতিবাদও করতে জানে।'

এবারের আকাশ পথে হানাদারির একটি পর্যায়ে ৬০টি সামরিক বিমান একসাথে গাজার ওপর আক্রমণ চালায়। ইসরায়েলের প্রধান পরামর্শদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রধানমন্ত্রী

বেঞ্জামিন নেহানহুকে টানা ন'দিন আক্রমণ চালিয়ে যেতে দিয়েছে। এমনকি প্রধান প্রধান বহুতল অট্টালিকাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার পরেও, যার মধ্যে একটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এবং কাতারের আলজাজিরার অফিস রয়েছে, পশ্চিমী দেশগুলি প্রতিরোধহীন মানুষের ওপর বোমামাজি বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সর্বমোট ১৮৪টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সংবাদ মাধ্যমের দপ্তর এমন ৩৩টি ভবনও। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী প্যালেস্তিনীয় সাংবাদিকদের হত্যা করার উদ্দেশেই নির্দিষ্ট করে আক্রমণ শানিয়েছিল। ভয়েস অফ আল-আক্সা রেডিওর সাংবাদিক ইউসুফ আবু হুসেইনকে তার বাড়ির ওপর মিসাইল আক্রমণ করে হত্যা করা হয়। সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকে স্তব্ধ করার ইসরায়েলি পরিকল্পনার অংশ এটি।

জো বাইডেন প্রশাসন একই ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে ঃ আত্মরক্ষার অধিকার ইসরায়েলের রয়েছে। গাজার অধিবাসী এবং অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের অভিমত হল, এবারে অসামরিক নাগরিকদের ওপর আক্রমণ ছিল অনেক বেশি তীব্র। বহু ক্ষেত্রেই বোমাবর্ষণের আগে সাধারণ মানুষকে সতর্ক পর্যন্ত করা হয়নি।

গাজার বহুতল ভবনগুলিকে ধ্বংস করার ছবি ইসরায়েলের দূরদর্শন চ্যানেলগুলিতে বার বার দেখানো হয়েছে জাতি বিদ্বেষী মন্তব্য ও সে দেশের সামরিক ক্ষমতার দম্ভ সংবলিত প্রচার সহ।

গাজায় হানাদারির ঠিক এক সপ্তাহ আগে বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলকে ৭৩৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রী করার কথা ঘোষণা করে। ওয়াশিংটন প্রতি বছর ইসরায়েলকে ৩.৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সহায়তা প্রদান করে। মার্কিন সিনেটের সদস্য হিসেবে বাইডেন একসময় বলেছিলেন, ইহুদি রাষ্ট্রটিকে বার্ষিক সামরিক সহায়তা, ঐ অঞ্চলে ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ এবং এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইসরায়েল গাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর এবং সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু সংখ্যা যখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তখনও বাইডেন ফোন করে নেতানহুকে হামাসের রকেট আক্রমণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের প্রত্যাঘাতের 'অধিকার'-এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। রাশিয়া ও চীন রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চাইলে, বাইডেন প্রশাসন তার বিরোধিতা করে। গত ৭০ বছরে ৪২ বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইসরায়েল বিরোধী নিন্দাসূচক প্রস্তাব আটকে দেয়।

ইসরায়েল সরকার ও পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যম তাদের সমর্থকগোষ্ঠী বিশ্ববাসীকে এটাই বিশ্বাস করাত চায় যে, ১৪০ বর্গ মাইলের গাজা ভূখণ্ড থেকে, যেখানে ২০ লক্ষ দরিদ্র মানুষের বাস, ইসরায়েল লক্ষ্য করে সেখানকার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যে রকেট হানা চালিয়েছে, তারই প্রত্যুত্তরে গাজার ওপর আক্রমণ। গাজার দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী 'উদ্বাস্তু' হিসেবে নথিভুক্ত। প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ এখনও উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করেন। গাজার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শিশু। এবারের আক্রমণে ইসরায়েল কয়েকটি উদ্বাস্তু শিবিরকেও বাদ দেয়নি।

গাজায় বেকারির হার ৫০ শতাংশের বেশি, যা বিশ্বে সর্বাধিক। জনসংখ্যার অর্ধেক বাইরে থেকে আসা খাদ্যত্রাণের ওপর নির্ভরশীল। গাজার সাধারণ মানুষের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির কারণ হল, গাজার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ইসরায়েলের অবরোধ। যা এই ভূখণ্ডটিকে কার্যত একটি মুক্ত কারাগারে পরিণত করেছে।

সব থেকে খারাপ দিক হল, ঠিক যে সময় গাজা ভূখণ্ড কোভিড -১৯ প্যানডেমিক অতিমারিতে জর্জরিত, ঠিক সেই সময়েই এই আক্রমণ নামিয়ে আনা হল। ইসরায়েল বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে ঐ ভূখণ্ডের একমাত্র কোভিড পরীক্ষার কেন্দ্রটিকে। গাজার ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা সত্ত্বেও, ঐ অঞ্চলে কোনো ধরনের টিকা ইসরায়েল সরবরাহ করেনি। ইসরায়েলের বোমা থেকে বাঁচার জন্য গাজার অধিবাসীদের বিভিন্ন ভীরে ঠাসা বিদ্যালয় ভবন অথবা আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে মাথা গুঁজতে হয়েছে। এর ফলে ওখানে করোনা সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে বলে প্রশাসকদের ধারণা। আর এটা এমন সময় ঘটবে যখন আহতদের চিকিৎসা আর মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ পরিকাঠামো সংস্কারের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছে। পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ গ্রিড, যেগুলি ভালো সময়েও মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়, আবারও বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্যালেস্তাইনের জন্য নিযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিউম্যানেটেরিয়ান কো-অর্ডিনেটর লিন হেস্টিংস সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পর মন্তব্য করেছেন, ইসরায়েলের এখনই অবরোধ তুলে নেওয়া উচিৎ এবং গাজাকে প্যালেস্তাইনের অবশিষ্ট অংশের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ দেওয়া উচিৎ। তিনি আরও বলেছেন, ''ওখানে যে সমস্ত পরিবারের বাসগৃহ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের দুঃখ আমি দেখেছি।'' লিন হেস্টিংস আরও বলেছেন, 'জনস্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল সরবরাহ ও কৃষি গুদামগুলি ইসরায়েলি বোমার আঘাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।'

এটা ঠিকই যে, গাজার কিছু জঙ্গী গোষ্ঠী মে মাসের ১০ তারিখে জেরুজালেমকে লক্ষ্য করে কিছু অনুন্নত রকেট ছেড়েছিল, যখন জেরুজালেম, ইসরায়েল এবং দখলিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের সর্বত্র প্যালেস্তিনীয়দের ওপর সন্ত্রাসের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গাজা থেকে ছোঁড়া অধিকাংশ রকেট হয় জনমানবহীন মরুভূমিতে পড়েছে, অথবা ইসরায়েলের অ্যান্টি মিশাইল 'আয়রন ডোম' সেগুলিকে আটকে দিয়েছে। অবশ্য কয়েকটি অপরিণত রকেট এবং মিশাইল ইসরায়েলের বহু বিজ্ঞাপিত নিশ্ছিদ্র 'আয়রন ডোম' ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রত্যাশা মতোই নেতানহু এই সুযোগকে ব্যবহার করে গাজায় অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণের আদেশ দেন। যদিও এবার কিন্তু তিনি আগের দুবারের মতো গাজায় সেনা পাঠান নি। আসলে যখন তিনি ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে মরিয়া, সেই সময়ে ইসরায়েলি সেনাদের বস্তাবন্দী মৃতদেহ দেশে ফিরে আসুক তা তিনি চাননি।

হামাসের নেতৃবৃন্দ ইতিপূর্বেই নেতানহু নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী সরকারকে সতর্ক করে জানিয়েছিল, জেরুজালেমের আল-আক্সা মসজিদে রমজানের সময় শান্তিপূর্ণভাবে নমাজ পড়তে না দিলে, তারা চুপ করে থাকবে না। পাশাপাশি পূর্ব জেরুজালেম সহ ইসরায়েলের অন্যান্য অংশে এবং অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে প্যালেস্তিনীয়দের আবাসস্থল যদি জবরদখল করার চেষ্টা করা হয়, তাহলেও তারা প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হবে।

এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখে, রমজানের প্রথম রাতে এবং গাজা থেকে প্রথম রকেট ছোঁড়ার ২৭ দিন আগে, ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী, মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের তৃতীয় পবিত্র মসজিদ আল-আক্সায় প্রবেশ করে সেখানকার নিরাপত্তা রক্ষীদের সরিয়ে দেয় এবং তার কেটে দিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে প্রার্থনা সম্প্রচারের সুযোগ কেড়ে নেয়। রাজনৈতিক ও আইনী দিক থেকে কোণঠাসা নেতানহু সরকারের এই বে-আইনী ও স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তেই গাজার ওপর আক্রমণের সূত্রপাত।

আল-আক্সা মসজিদের কাণ্ড ঘটানোই হয়েছে নেতানহুর রাজনৈতিক জীবনকে বাঁচানোর জন্য। কারণ প্রধানমন্ত্রীত্ব গেলেই তাঁকে দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের দায়ে জেলে যেতে হবে। □

[সৌজন্যে ঃ ফ্রন্টলাইন পত্রিকা, ১৮ জুন, ২০২১]

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
48th Year, 11-12th Special E-Edition, April-May 2021

Regd. No. : 18484/71

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ২৯ /২১ তারিখ ঃ ২৬-০৪-২০২১

প্রতি,
মাননীয় সচিব,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
স্বাস্থ্য ভবন, লবনহ্রদ, কলকাতা

মহাশয়,

আপনি নিশ্চিয়ই অবহিত আছেন যে, মারণ করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত সকল কর্মীদের জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা বলয় তৈরির (পি পি ই পোশাক, তিন লেয়ার মাস্ক, স্যানিটাইজার, থার্মাল স্ক্যানার সহ অন্যান্য বন্দোবস্ত) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য স্তরের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় টিকাকরণের অনুরোধ করছি। বিগত বছর, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মাননীয় মুখ্য সচিবের হস্তক্ষেপ চেয়ে ১০ দফা প্রস্তাবনাও পেশ করা হয়েছিল (পত্র নং ঃ কো-অর্ডি / ৩৭/২০ তারিখ ঃ ৩/৬/২০২০)। রাজ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে দৈনিক সংক্রমণের হার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনরায় মাননীয় মুখ্য সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে (পত্র নং ঃ কো-অর্ডি/২৭/২১ তারিখ ঃ ১৫/৪/২০২১) কিন্তু, দুঃখের বিষয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও পরিস্থিতির কোনো কাঙ্খিত অগ্রগতি ঘটেনি।

আপনি এও অবহিত আছেন যে, ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কোভিড-১৯ অতিমারী পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। গোষ্ঠী সংক্রমণের মাধ্যমে দৈনিক সংক্রমণের হার ক্রমান্বয়ে উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী কাজের সাথে যুক্ত আধিকারিক সহ একাধিক কর্মচারী করোনা সংক্রমিত হওয়ায় কর্মী মহলে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কুচবিহার জেলা থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের কাকদ্বীপ পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারী দপ্তরে দ্রুতলয়ে সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনরায় ৫০ শতাংশ কর্মী দিয়ে কাজ করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমত পরিস্থিতিতে সারা রাজ্যে সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারের মধ্যে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে বলবৎ আইনগুলো রূপায়ণে বিদ্যমান / নতুন করে তৈরি প্রোটোকল বা গৃহীত পরিচালন ব্যবস্থা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কতগুলো জরুরি বিষয়ে পুনরায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

(১) গত ১৮ মে, ২০২০ (Memo No. 177-CS/2020 Dt. 18/5/20) মাননীয় মুখ্য সচিবের নির্দেশিকায় সর্ব সাধারণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত প্রোটোকল ব্যবহার যোগ্য এলাকা / অফিসগুলোতে (hygiene protocol) এর বন্দোবস্ত রাখতে যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিয়ে বলা হয়েছিল (স্যানিটাইজেশন, মাস্ক ব্যবহার ইত্যাদি) তাও সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নিযুক্ত কর্মীসহ ইচ্ছুক সকল মানুষের অনতিবিলম্বে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) নির্বাচনী কাজে যুক্ত সরকারী কর্মচারীদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হলেও নির্বাচনের আওতার বাইরে থেকে যাওয়া কর্মচারী ও সকল কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের সরকারী ব্যবস্থাপনায় টিকাকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

(৪) ইতিমধ্যে, অধিকাংশ সরকারী দপ্তরে ৫০ শতাংশ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অথচ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রয়োজন ভিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন।

(৫) কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলায় যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, দমকলকর্মী সহ অন্যান্য কর্মচারীদের যুক্ত করা হয়েছে (ইতিমধ্যে অনেকে প্রয়াত হয়েছেন) তাদের সরকার নির্দিষ্ট বীমার আওতায় আনা হচ্ছে না। বিষয়টি উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

(৬) কোভিড-১৯ সংক্রমিত মানুষদের সরকারী স্বাস্থ্য পরিবষেবায় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নির্ধারন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

(৭) বিপর্যয় মোকবিলায় সরকারী ব্যবস্থাপনায় অক্সিজেন সরবরাহ সহ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি সাধনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমরা মনে করি সম্মিলিত এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/৩৮/২১ তারিখ ঃ ২০-০৫-২০২১

প্রতি,
মাননীয় মুখ্য সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
নবান্ন, হাওড়া

মহাশয়,

আপনায় হয়তো স্মরণে আছে যে মারণ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণে আনতে আপনার হস্তক্ষেপ চেয়ে ইতিপূর্বে কতগুলি জরুরী বিষয়ে আপনাকে (পত্র নং ঃ কো-অর্ডি/২৭/২১ তারিখ ঃ ১৫/৪/২০২১) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাননীয় অতিরিক্ত প্রধান সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু, কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যতিরেকে পরিস্থিতির সামগ্রিক অগ্রগতির কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি।

সম্প্রতি, গত ১৫ মে, ২০২১ তারিখে আপনার নির্দেশক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ থেকে (Memo No. 106/Secy/(H&FW) dt. 18/5/21) প্রকাশিত টিকাকরণ সংক্রান্ত নির্দেশিকায় বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত নাগরিকদের টিকাকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, উক্ত তালিকার বাইরে থেকে যাওয়া প্রবীণ নাগরিক সহ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের (৬০ উর্ধ্বে) একটা বড় অংশ ভ্যাকসিনের অপ্রতুলতা জনিত কারণে প্রতিষেধকের সুযোগ থেকে এখনও বঞ্চিত।

এছাড়াও রাজ্য প্রশাসনে যুক্ত স্থায়ী এবং অস্থায়ী / চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও টিকাকরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। ফলে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়। স্বভাবতই সেই সব কর্মচারী ও তার পরিবার আতঙ্কিত হয়ে আছেন।

এমতাবস্থায়, এই অংশের নাগরিকদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকাকরণের আওতাধীন করার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

একই সাথে, করোনা মোকাবিলায় যুক্ত থাকা প্রথম সারির স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা কোভিডে আক্রান্ত হলে সরকারী ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই নিশ্চয়তা তাদের কাজে আরও উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করবে।

আশা করি আপনি বিষয়গুলি সহানুভূতির সাথে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

মে দিবস, মালদহ

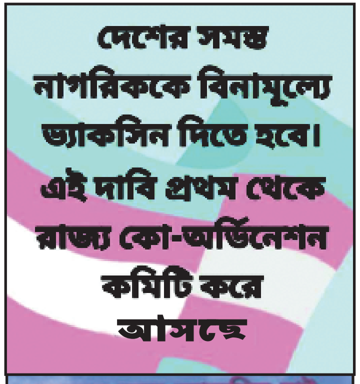

মে দিবস, দক্ষিণ দিনাজপুর

ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন-এর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিজনিত লকডাউনের কারণে এপ্রিল-মে সংখ্যার মুদ্রণ সম্ভব হলো না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী সংখ্যা থেকে যথারীতি মুদ্রিত পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

—পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।